# সেলিম চিস্তি

নিমাই ভট্টাচার্য

ডি.এম. লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রকাশক :
গোপালদাস মজুমদার
ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, বিধান সরণী
কলিকাতা—৬

প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৬৪

প্রচ্ছদ শিল্পী :
গৌতম রায়

মুদ্রাকর :
সনাতন হাজরা
প্রভাবতী প্রেস
৬৭, শিশির ভাদুড়ী সরণী
কলিকাতা—[illegible]

চিরকল্যাণীয়া

শ্রীমতী কল্যাণী দে

SELIM CHISHTI

By

NIMAI BHATTACHARYYA

## এই লেখকের অন্যান্য বই-

কেয়ার অব ইণ্ডিয়ান এম্বাসী
ভায়া ডালহৌসী
মেমসাহেব
ডিপ্লোম্যাট
রাজধানীর নেপথ্যে
রিপোর্টার
পার্লামেণ্ট ষ্ট্রীট
আকাশভরা সূর্যতারা
যৌবন নিকুঞ্জে
এ-ডি-সি
ককটেল
তোমাকে
ওয়ান আপ-টু ডাউন
উইং কমাণ্ডার
ডিফেন্স কলোনী
হরেকৃষ্ণ জুয়েলার্স
রাজধানী এক্সপ্রেস
ম্যাডাম
প্রবেশ নিষেধ
মোগলসরাই জংশন
অনুরোধের আসর
পিকাডিলী সার্কাস
ব্যাচেলার
নাচনী
কেরাণী
বিশেষ সংবাদদাতা প্রেরিত
অন্তদিন
রবিবার
হকার্স কর্ণার
ইনকিলাব
ডার্লিং
সোনালী
ভাগ্যং ফলতি সর্বত্র
ভি-আই-পি

বি. দ্র. :—অনুভব, হরেরাম হরেকৃষ্ণ এবং এয়ার হোষ্টেস, আমার লেখা নয়।

নি. ভ

# সেলিম চিস্তি

দেওয়ান-ই আম'-এ এখন আর সম্রাট বিচার করেন না। দেওয়ান-ই-খাস্'-এ বীরবলের সঙ্গে পরামর্শ হয় না সম্রাটের। রাজপুত দুহিতা, জাহাঙ্গীর পত্নী যোধবাঈ তুলসী মঞ্চে প্রণাম করে দেওয়ান-ই-খাস্-'এর আসরে আসন গ্রহণ করেন না। সে সব দিন শেষ। ফুরিয়ে গেছে। ফতেপুর সিক্রী এখন মূক, বধির, প্রাণহীন। মিঞা তানসেনের গান শুনে যে রাজপ্রাসাদের মানুষ চঞ্চল হয়ে উঠত সকালে, সন্ধ্যায়, চারপাশের গ্রামের মানুষ মুগ্ধ হতো যে সঙ্গীত সম্রাটের সুরে, সে অমৃত কণ্ঠস্বর আর শোনা যায় না।

সম্রাট নেই, সম্রাজ্ঞী নেই, নেই রাজপুত্র, মন্ত্রী, রাজ-জ্যোতিষী, গায়ক, সখী, বাঈজী, নর্তকী। কেউ নেই। সেনাপতি তো দূরের কথা, একজন সাধারণ সৈন্য পর্যন্ত নেই ফতেপুর সিক্রীতে। বুলান্দ দরওয়াজায় আজ আর অশ্বারোহী সৈন্যরা পাহারা দেয় না।

তা না হোক। আজও মানুষের কলগুঞ্জনে মুখরিত হয় ফতেপুর সিক্রী। প্রাণহীন এই প্রাসাদ, তার পুরোনো দিনের স্মৃতি সারা দেশের মানুষকে ঘর-ছাড়া করে। টেনে আনে। সারা বছর ধরে তারা আসে। দেখে। ভাবে। একটু আনমনা হয়ে ফিরে যায়।

না, রাজপ্রসাদ দেখেই ফিরে যায় না। সবাই আসে শেখ সেলিম চিস্তির সমাধিতে। প্রণাম করে, প্রার্থনা করে। শ্বেতপাথরের জালিতে লাল সুতো বাঁধে। শ্বেত, শুভ্র, নির্মল, পবিত্র তীর্থে এসে কামনা-বাসনার আগুন ছড়িয়ে যায় সবাই।

'পাপিয়া, তুমি কিছু প্রার্থনা করে লাল সুতো বাঁধবে না?'

'না।'

অবাক হয় রঞ্জন, 'সেকি'? এবার একটু কাছে এসে, নিবিড় হয়ে পাশে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় বললো, 'শুনেছি সেলিম চিস্তির কাছে কিছু চাইলে পাওয়া যায়।'

'আমিও শুনেছি।'

'তুমি কিছু চাইবে না? তোমার কোন প্রার্থনা নেই?'

পাপিয়া মুখ ঘুরিয়ে রঞ্জনের দিকে তাকিয়ে বললো, 'আমি মুখ ফুটে চাইলেই সেলিম চিস্তি আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করবেন ?'

রঞ্জন ঠিক জবাব দিতে পারেনি। 'না, তা ঠিক নয়, তবুও

'সেলিম চিস্তি নিশ্চয়ই আমার মনের কথা জানেন।'

সারা বছর ধরে মানুষের স্রোত বয়ে যায় এই সেলিম চিস্তির সমাধিতে। শীত গ্রীষ্ম শরৎ হেমন্ত। সব সময়। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। আজ কোজাগরী লক্ষ্মী পূর্ণিমা। বিকেল হতে না হতেই সবাই তাজের পথে। বিবর্ণ মনকে একটু রঙীন করবার জন্য আজ সেলিম চিস্তির সমাধি ছেড়ে সবাই যমুনাপারের তাজ দেখতে চলেছেন।

যখন শেষ দর্শনার্থীর দল ফতেপুর সিক্রীর পাহাড় থেকে নীচে নামতে শুরু করেছেন তখন বিবেক আস্তে আস্তে শেখ সেলিম চিস্তির সমাধির সামনে এগিয়ে গেল।

'তোমার কাছে আমি আর কিছু চাই না, শুধু বছরে একবার আমাকে সেলিম চিস্তির সমাধিতে নিয়ে যেও।'

'আমার কাছে আর কিছু চাও না ?'

'না'।

বিবেক অবাক হয়। একটু ভাবে। 'সেলিম চিস্তির সমাধিতে গিয়ে কোন কিছু মানত করবে ?'

'না, না, সেসব কিছু না।'

'তবে ?'

'কিছুই না, শুধু ভাল লাগে।' একটা চাপা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ে বিবেকের স্ত্রী। দৃষ্টিটা একটু যেন দূরের দিকে ছড়িয়ে দেয়। 'খুব ভাল লাগে ওখানে গেলে। মনে ভীষণ শান্তি পাই।'

বিবেক প্রত্যেক বছর স্ত্রীকে এনেছে। ফতেপুর সিক্রীতে এসে আকবরের প্রাসাদ দেখেনি। সারাদিন কাটিয়েছে এই সমাধি মন্দিরে। বিবেক বাধা দেয় না, কিছু বলে না। শুধু দেখে, বিভোর হয়ে দেখে আনমনা স্ত্রীকে।

হাসতে হাসতে বিবেক বলে, 'তুমি বোধহয় গতজন্মে সেলিম চিস্তির কেউ ছিলে।'

বিবেকের স্ত্রী হাসে।

'হাসছ ?'

'হাসব না ?'

'সত্যি বলছি তুমি ওখানে গেলে এমন বিভোর হয়ে যাও, আত্মভোলা হয়ে যাও যে আমার সত্যি মাঝে মাঝে মনে হয়···

সমাধির মুখোমুখি হতেই থমকে দাঁড়াল।

'হ্যাগো, তোমাকে আমি বড্ড কষ্ট দিই, তাই না?'

'না, না, কষ্টের কি আছে?'

'কষ্ট বৈকি! আমার খামখেয়ালীপনার জন্য তোমাকেও দুর্ভোগ সহ্য করতে হয়।'

বিবেক একটু কাছে টেনে নেয় স্ত্রীকে। 'আমার একটুও কষ্ট হয় না, বরং··

'তুমি আমার উপর রাগ করো না।'

পাহাড় দিয়ে নামতে নামতে বিবেক বুকের কাছে টেনে নেয় স্ত্রীকে। 'রাগ করব কেন?'

'বিশ্বাস কর, এখানে এলে আমার খুব ভাল লাগে। এখানে না এসে আমি থাকতে পারি না।' মুখ থেকে নয় অন্তর থেকে কথাগুলো বেরিয়ে এলো।

বিবেক যেন সব কথা শুনতে পাচ্ছে।

'যখন আমি থাকব না, তখন তুমি এসো। সেলিম চিস্তির সমাধির আশে-পাশেই আমার আত্মা ঘোরাফেরা করবে। আমি এখান থেকে কোথাও যাব না।'

ভাবতে গিয়েই বিবেকের চোখে জল আসে। তবু আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল। একবার সেলিম চিস্তির সমাধির দিকে তাকিয়েই দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে নিল। এপাশ থেকে ওপাশ।

মাঝ পথে আটকে গেল। মনে হলো এই ভদ্রলোককে যেন আগেও দেখেছে বিবেক। এই শেখ সেলিম চিস্তির সমাধিতেই। গত বছর। পর পর কয়েক বছর। একবার এক হোটেলেই বোধহয় ছিল দুজনে।

টাঙ্গাওয়ালা এসে ভদ্রলোককে ডাক দিল, 'সাব! চ'লয়ে। রাস্তা অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে।'

ভদ্রলোক ঘুরে দাঁড়াতেই বিবেক যেন চিনতে পারল। কিছু বললো না। মনে মনে ভাবল, শেখ সেলিম চিস্তির কাছে ইনিও কিছু গচ্ছিত রেখেছেন নাকি?

তুফান এক্সপ্রেসের কামরায় দুজনের দেখা। টুণ্ডলা পার হবার পরই আলাপ হলো। বিবেক জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি প্রায়ই দিল্লী আসেন ?'

'কেন বলুন তো ?'

'মনে হয় পর পর কয়েক বছর আপনাকে ফতেপুর সিক্রীতে দেখেছি।'

'ফতেপুর সিক্রী মানে শুধু সেলিম চিশ্তির সমাধিতে যাই।'

'হাঁ, হাঁ, সেলিম চিশ্তির সমাধিতেই দেখেছি।'

এবার রঞ্জন জানতে চাইল, 'আপনিও বুঝি প্রত্যেক বছর এদিকে আসেন ?'

একটু শুকনো হাসি হাসল বিবেক। একটা দীর্ঘনিশ্বাসও ছাড়ল 'আসি মানে আসতে হয়, না এসে পারি না।'

'কিছু মানত করেছেন বুঝি ?'

'কিছু মানত করিনি। সেলিম চিশ্তির কাছে আমার কিছু চাইবার নেই।'

'তবে আসেন কেন ?'

তুফান এক্সপ্রেস চলছে। কানপুর, ফতেপুর পার হয়ে এলাহাবাদ আসে রাতের অন্ধকারে। প্রায় সবাই ঘুমিয়ে পড়েছেন। এদের দুজনের চোখে ঘুম নেই।

'আচ্ছা রঞ্জনবাবু, মারা যাবার পর আত্মার দেখা পাওয়া যায় ?'

'ঠিক জানি না, তবে অনেকে বলেন, পাওয়া যায়।'

বিবেকবাবু তলিয়ে যান নিজের মধ্যে।

বোধহয় মির্জাপুর এলো।

রঞ্জন প্রশ্ন করলো, 'আপনি কি অলৌকিক কিছু দেখার আশায় সেলিম চিশ্তির সমাধিতে যান ?'

'না তা ঠিক নয়, তবে আমার স্ত্রী বলেছিল মরার পর সেলিম চিশ্তির সমাধির আশেপাশেই থাকবে...'

'উনি বুঝি সেলিম চিশ্তির ভক্ত ছিলেন ?'

'নিশ্চয়ই ছিল, তা নয়ত প্রত্যেক বছর কেন আসত ?'

'প্রত্যেক বছর আসতেন ?'

'হ্যাঁ।'

'বোধহয় সেলিম চিশ্তির কাছে মানত করে কিছু পেয়েছিলেন। অথবা...

বিবেকবাবু তাড়াতাড়ি ওকে বাধা দিয়ে বললেন, 'না রঞ্জনবাবু, ও কিছু মানত করত না। চুপ করে বসে বসে কি যেন ভাবত। তন্ময় হয়ে ভাবত।'

রাত আরো গভীর হয়।

'জানেন রঞ্জনবাবু, হঠাৎ আমাদের বিয়ে হয়। আমার স্ত্রী আগ্রাতে ওর ছোট মামার কাছে ছিলেন। আমার শ্বশুর মশাই ওকে টেলিগ্রাম করে কলকাতা আনান। ও আসার দুদিন পরেই আমাদের বিযে হয।'

'তারপর ?'

'বিয়ের পর আমার স্ত্রী আমাকে শুধু একটি অনুরোধ করেছিলেন…'

'কি ?'

'প্রত্যেক বছর এই সেলিম চিস্তির সমাধিতে আনার অনুরোধ করেছিলেন।'

রঞ্জনের যেন কেমন লাগে শুনতে। একটু ভাবে। 'উনি কি আর্কিওলজিতে ইণ্টারেস্টেড ছিলেন ?'

'ওর মামা আর্কিওলজি ডিপার্টমেণ্টে কাজ করেন। আগে বহুদিন আগ্রা-ফতেপুর সিক্রীতে ছিলেন।'

হঠাৎ রঞ্জন জিজ্ঞাসা করে, 'কি নাম বলুন তো ?'

'সুধীর সরকার।'

মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, 'সুধীরদা !'

সুধীর সরকারের নাম শুনতেই রঞ্জনের হৃৎপিণ্ডটা হঠাৎ থমকে দাঁড়াল, মুখখানা কালো হযে গেল, কিন্তু অন্ধকার কম্পার্টমেণ্টে বিবেকবাবু বুঝতে পারলেন না। জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওকে চেনেন নাকি ?'

'হ্যাঁ চিনি।'

'আপনিও কি আর্কিওলজি ডিপার্টমেণ্টে কাজ করেন ?'

আর সত্যি কথা বলতে পারল না রঞ্জন। বললো, 'না।'

বিবেকবাবু পার্সের ভিতর থেকে একটা ফটো বের করে প্যাসেঞ্জের আবছা আলোয় এগিয়ে ধরলেন, 'রঞ্জনবাবু, আমার স্ত্রীর ছবি।'

রঞ্জন ও ছবি দেখতে চায়নি। ও ছবি ওর মনের মধ্যে অসংখ্য স্মৃতির মালা দিয়ে বাঁধনো আছে। তবু না দেখে পারল না। পাপিয়া !

ট্রেন মোগলসরাই স্টেশন ঢুকছে। রঞ্জন তাড়াতাড়ি সুটকেশটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল 'নমস্কার।'

'এখানেই নামবেন ?'

'হ্যাঁ, আমি একটু বেনারস ঘুরে যাব।'

'আপনার ঠিকানাটা…

রঞ্জন হাসল, 'কোন দরকার নেই। ঐ শেখ সেলিম চিস্তির সমাধিতেই দেখা হবে।'

# অনুসন্ধান অফিস

লক্ষ্মী দত্ত লেনের গোরা দত্তকে চেনেন? তপু, ছোটভাই, দেবী, মানা, জ্যোতিকে? সারা বছর পাড়ার মোড় গরম করে রাখে। গরম গরম তেলে-ভাজার মত গরম আর মুখরোচক করে রাখে। কেউ রোগা, কেউ মোটা, কেউ লম্বা, কেউ বেঁটে, কেউ ফর্সা, কেউ কালো; কেউ চাকুরিয়া, কেউ বেকার। কেউ আলুরি, কেউ ফুলুরি, কেউ পিঁয়াজী, কেউ বেগুনী, কেউ আলুর চপ অথবা কচুরি। তা হোক। সবাই তাজা, সবাই গরম, সবাই টাটকা, সবাই মুখরোচক।

এক কথায় পাড়ার মস্তান এরা। কিন্তু কেউ কোনদিন কোন কমিটির মেম্বার হলো না। ছোটভাই বলে, অল পার্টি নমিনেশন পেয়েছিলুম ইউনাইটেড নেশনস-এ যাবার জন্য। তাই গেলুম না। তা আবার দুগ্‌গা পুজো কমিটিতে?

পাড়ার এই মস্তানরা কমিটি গড়ে, কমিটি ভাঙে, কিন্তু কমিটিতে ঢুকবে না। দুগ্‌গা পুজোর কমিটিতেও না।

নিবেদিতা লেনের শঙ্করবাবুকে তো নিশ্চয়ই চেনেন। ঐ যে রোজ সকালে ধাক্কা মেরে স্টার্ট করে মরিস এইট-এ চেপে শিয়ালদা কোর্টে যান, যার বাড়ীর দরজায় প্যাথরে বড় বড় করে খোদাই করে ইংরেজীতে লেখা আছে, শাংকার-লাল সারকার, এম-এ, বি এল। তিনি পর্যন্ত বলেছেন। কিন্তু পাড়ার মস্তানদের ইউনাইটেড ফ্রন্ট ভাঙা যায়নি।

ছোটভাই হাত-পা নেড়ে বলেছে, শঙ্করদা, রোজ সকালে ধাক্কা মারা মরিসে চেপে শিয়ালদা কোর্টে যাচ্ছ আর আসামীদের বদলে ম্যাজিস্ট্রেটদের সাজা পাইয়ে দিচ্ছ অথচ আমাদের এই সিম্পল কেসটা বোঝ না? আমি বা গোরা যদি তোমাদের সঙ্গে কোয়ালিশন করে মা দুগ্‌গার ক্যাবিনেটে জয়েন করি, তাহলে কি আমাদের ইউনিটি থাকবে?

শঙ্করদা এবার লজিক খুঁজে পায়। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

'তাছাড়া আমরা পাওয়ার হাঙরী না। আমরা অনুসন্ধান অফিসের চার্জেই থাকব।'

ছোট ভাই প্রাইভেটলি শ্যামলকে বলেছে, অনুসন্ধান অফিসে চার্জ নেবার কারণ ভেরি সিম্পল। চেয়ারে বসে, টেবিলে পা তুলে, দুহাতে দুটো মাইক্রোফোন নিয়ে কাজ করার একটা প্লেজার আছে। পুজো এণ্টারটেনমেণ্ট, ইমারসন, ডেকরেশন—যাতেই যান না তাতেই ঝামেলা। এই আরাম কোথাও নেই। তাছাড়া ভ্যারাইটি মানুষ দেখার মতন এত সুযোগ কোথাও পাবেন না।

একটু থেমে কলিগদের মুখের ওপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে নিয়ে আবার বলে, বছর বছর হাজার হাজার ছেলেমেয়ে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় হারিয়ে যাচ্ছে। আমি, গোরা, তপু, মানা মাইকে ঘন ঘন ঘোষণা করে তাদের উদ্ধার করছি। দেবী আর জ্যোতি লং হ্যাণ্ডে সব নোট নিয়ে যাচ্ছে।

'লং হ্যাণ্ডে নোট নেয় মানে?'

'গত দশ বছরের কালেকশন দেখলেই বুঝবেন। দিনের আলোর মত সুস্পষ্ট করে বুঝবেন। আমরা নিজেরা এডিট করে যা দাঁড় করিয়েছি, তাতেই কেল্লা ফতে। শ্যামলদা যদি এডিট করে দেয়, তাহলে তো শরৎচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের সেল বন্ধ হয়ে যাবে।'

'একবার চোখ বুলিয়েই দেখুন না!'

**প্রথম বছর**

…'ভাটপাড়া, ভাটপাড়া থেকে এসেছেন উদয়নকুমার সরকার। আপনার জন্য শ্রীমতী বলাকা ঘোষ অনুসন্ধান অফিসে অপেক্ষা করছেন।… উদয়নকুমার। আপনি যেখানেই থাকুন, এক্ষুনি অনুসন্ধান অফিসে আসুন।'

—'দমদম, দমদম থেকে এসেছেন শ্রীমতী মালতী সেন। আপনি এক্ষুনি অনুসন্ধান অফিসে চলে আসুন। আপনার জন্য অলক মুখার্জী অপেক্ষা করছেন।'

…'টালিগঞ্জ ক্ষেত্রমোহন নস্কর রোড থেকে এসেছেন আশিসবাবু! আপনার জন্য আপনার স্ত্রী বেলা…'

…'বরানগর নেতাজী কলোনীর অনিন্দ্য রায়! আপনার জন্য দক্ষিণেশ্বরের ভারতী বসাক অনুসন্ধান অফিসে…'

…'দুয়ের এক! দুয়ের এক হিদারাম ব্যানার্জী লেনের তৃপ্তি বসু!

আপনার জন্ত অশোক মিত্র অনুসন্ধান অফিসে…'

…'ফার্ন রোড ! ফার্ন রোড থেকে এসেছেন রজনীগন্ধা দাশগুপ্তা। রজনীগন্ধা দাশগুপ্তা ! আপনার জন্ত তপন বসু…'

…'বিরাটি ! বিরাটি থেকে এসেছেন মৃন্ময় ভট্টাচার্য ! আপনার জন্ত কমলা অধিকারী অনুসন্ধান অফিসে…'

…'যে কোন স্বেচ্ছাসেবককে বললেই তারা অনুসন্ধান অফিসের সন্ধান দিয়ে দেবেন।'

…'সরস্বতী হোস্টেলের শ্রীমতী অলকা মণ্ডল। অলকা মণ্ডল ! আপনি যেখানেই থাকুন, এক্ষুনি অনুসন্ধান অফিসে চলে আসুন। আপনার জন্ত ক্যাপ্টেন মালহোত্রা…'

…'মুঙ্গের সে আয়া দেওকীনন্দন মিশ্রজী ! আপ যাহা পর হো জলদি সে এনকোয়ারি অফিস মে আযাইয়ে। আপকে লিয়ে পাটনাকা ফুল্লরাবাঈ ইন্তেজার।'—

## দ্বিতীয় বছর

…'নিউ আলিপুর থেকে এসেছেন শ্রীমতী অরুন্ধতী ঘোষ ! আপনি এক্ষুনি অনুসন্ধান অফিসে…। আপনার জন্য বালীগঞ্জ গার্ডেনস্-এর তরুণ সরকার অপেক্ষা করছেন।'

…'আদিত্য মিত্র ! ল্যান্সডাউন থেকে এসেছেন আদিত্য মিত্র ! আপনার জন্ত হাজরা লেনের বিনতা মুখার্জী…। আপনি যেখানেই থাকুন…।'

…'বরানগর নেতাজী কলোনীর অনিন্দ্য রায় ! আপনার জন্ত আপনার স্ত্রী ভারতী রায়…। আপনি যেখানেই থাকুন সত্বর…।'

…'দমদম থেকে এসেছেন অলক মুখার্জী ! আপনার জন্য মালতী সেন অনুসন্ধান অফিসে অপেক্ষা করছেন।'

…'এণ্টালী থেকে এসেছেন অতুল দত্ত ! আপনি এক্ষুনি অনুসন্ধান অফিসে চলে আসুন। আপনার জন্য ফার্ন রোডের রজনীগন্ধা দাশগুপ্তা…'

…'নৈহাটি ভাটপাড়া থেকে এসেছেন শ্রীমতী বলাকা ঘোষ। আপনার জন্ত উদয়ন সরকার অনুসন্ধান অফিসে

…'হিদারাম ব্যানার্জী লেনের তৃপ্তি বসু ! তৃপ্তি বসু। আপনার জন্ত

অশোক মিত্র এক নম্বর গেটের সামনে অপেক্ষা করছেন। তৃপ্তি বসু, আপনি এক্ষুনি এক নম্বর গেটের সামনে যান। যে-কোন স্বেচ্ছাসেবককে জিজ্ঞাসা করলেই তারা আপনাকে এক নম্বর গেট দেখিয়ে দেবেন।'

'ক্যাপ্টেন মালহোত্রা। ক্যাপ্টেন মালহোত্রা। প্লিজ গো টু কফি বার। মিস অলকা মণ্ডল ইজ ওয়েটিং ফর ইউ।'

'দেওকীনন্দন মিশ্র। দেওকিনন্দন মিশ্র। আপ ফোবন এক নম্বর গেট কা পাশ চলা যাইয়ে। আপকে লিয়ে পাটনাকা মধুমতীবাঈ ইন্তেজার ·'

## তৃতীয় বছর

'মোগলসরাই থেকে এসেছেন অনিল ব্যানার্জী। অনিল ব্যানার্জী! আপনার জন্য আপনার স্ত্রী মঞ্জু ব্যানার্জী অনুসন্ধান অফিসে । আপনি তাড়াতাড়ি অনুসন্ধান অফিসে চলে আসুন।'

'ফার্ণ রোড থেকে এসেছেন রজনীগন্ধা দাশগুপ্তা। আপনার জন্য ডাঃ অশেষ বর্মন মিল্ক বারে অপেক্ষা করছেন। রজনীগন্ধা দেবী! আপনি এক্ষুনি মিল্ক বারে চলে যান।'

· 'নৈহাটি থেকে এসেছেন উদয়ন সরকার। উদয়নবাবু! আপনার স্ত্রী শ্রীমতী মিনতি সরকার অনুসন্ধান অফিসে ।'

· 'f রাটি থেকে এসেছেন মৃন্ময় ভট্টাচার্য। আপনার জন্য আরতি রাহা অনুসন্ধান আফসে· । আপনি যেখানেই থাকুন '

'হাজরা লেনের বিনতা মুখার্জী। আপনার জন্য নিউ আলিপুরের তাপস সেন অনুসন্ধান অফিসে '

·· 'বেলেঘাটা সি-আই টি রোড থেকে এসেছেন মীরা রায়। আপনার জন্য স্কোয়ার্ডন লীডার ঘোষ অনুসন্ধান অফিসে···। আপনি সত্বর···। স্বেচ্ছাসেবকদের জিজ্ঞাসা করলেই অনুসন্ধান অফিসের খবর পাবেন।'

' সরস্বতী হোস্টেলের মিস অলকা মণ্ডল! মিস মণ্ডল। আপনার জন্য ক্যাপ্টেন ইন্দুরকার অনুসন্ধান অফিসে '

## চতুর্থ বছর

···'দমদম থেকে এসেছেন মিস মালতী সেন। মিস সেন। আপনার জন্য অলক মুখার্জী পূজা মণ্ডপে অপেক্ষা করছেন। মিস মালতী সেন পূজা মণ্ডপে যান।'

…'বিরাটি থেকে এসেছেন আরতি রাহা। মিস আরতি রাহা! আপনার জন্য মৃণ্ময় ভট্টাচার্য…'

…'মিসেস বন্দনা সরকার! আপনার জন্য ক্যাপ্টেন মালহোত্রা গাড়ীতে অপেক্ষা করছেন। মিসেস সরকার! আপনি গাড়ীর কাছে চলে যান।'

'জামালপুর! জামালপুর কা ইন্দুবাঈ! ইন্দুবাঈ! আপ ফোরন এক নম্বর গেট পর…। দেওকীনন্দনজী আপকে ইন্তেজার· '

…'ডাঃ অশেষ বর্মন! ডাঃ বর্মন! আপনার জন্য আপনার স্ত্রী রজনীগন্ধা দেবী অনুসন্ধান অফিসে··। ডাঃ বর্মন! আপনি অনুসন্ধান অফিসে আসুন।'

…'টালিগঞ্জ ক্ষেত্রমোহন নস্কর রোড থেকে এসেছেন আশিসবাবু। আশিস ভট্টাচার্য! আপনার স্ত্রী বেলা দেবী ও আপনার মেয়ে শকুন্তলা·· '

…'নিউ আলিপুর থেকে এসেছেন শ্রীমতী অরুন্ধতী ঘোষ। মিস ঘোষ, আপনার জন্য অভিজিৎ মল্লিক অনুসন্ধান অফিসে '

…'হাজরা লেনের শ্রীমতী বিনতা মুখার্জী। বিনতা দেবী! আপনার জন্য আদিত্য মিত্র অনুসন্ধান অফিসে । আপনি সত্বর অনুসন্ধান অফিসে চলে আসুন।'

…'ভাটপাড়া থেকে এসেছেন উদয়ন সরকার! উদয়নবাবু! আপনার জন্য আপনার স্ত্রী মিনতি সরকার ও খোকন অনুসন্ধান অফিসে…'

'স্কোয়ার্ডন লীডার ভরদ্বাজ! স্কোয়ার্ডন লীডার ভরদ্বাজ! মিস অলকা মণ্ডল ইজ ইন দি কফি কর্নার! স্কোয়ার্ডন লীডার ভরদ্বাজ! প্লিজ গো টু কফি কর্নার!'

…'গয়া সে আয়া লছমীবাঈ! লছমীবাঈ! আপ জলদি সে বাহার গেট কা পাশ আ যাইয়ে। মুঙ্গের কা দেওকীনন্দনবাবু আপকে ইন্তেজার মে ··

·· 'বেলেঘাটা সি-আই-টি রোড থেকে এসেছেন মীরা রায়! মিস রায়! আপনার জন্য স্কোযার্ডন লীডার ঘোষ গাড়ীতে অপেক্ষা করছেন।'

…'বিরাটি থেকে এসেছেন আরতি রাহা! আরতি রাহা! আপনি এক্ষুনি অনুসন্ধান অফিসে চলে আসুন। আপনার জন্য মৃণ্ময় ভট্টাচার্য ··'

চোখ বুলিয়ে যেতে ভারী মজা লাগছিল। তাজা গরম মুখরোচক আলুর চপটা শেষ করতে না করতেই গোরা নীলুর দোকানের পান এনে দিল। পানটা খেয়ে ঠোঁট লাল করার আগেই মনটা লাল হয়েছিল।

তপু বল্লো, কি, কেমন লাগছে ?

'বেশ ভাল।'

ছোটভাই বল্লো, এই অনুসন্ধান অফিসে বসি বলে আমরা তো কেউ কোন পূজা সংখ্যা কিনি না। সাতটা উপন্যাস, তিরিশটা বড় গল্প, দু'শোটা ছোট গল্পের চাইতেও অনেক বেশী, অনেক ভাল, অনেক ইন্টারেষ্টিং পূজা সংখ্যা বিনি পয়সায় চোখের সামনে দেখতে পাই।

একটু থেমে আবার বলে, এই কলকাতা শহরে ছেলেমেয়েদের ইয়ে-টিয়ে নিয়ে কম কাণ্ড তো হচ্ছে না। মারামারি, কাটাকাটি, ডিভোর্স থেকে শুরু করে মার্ডার পর্যন্ত হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কলকাতা পুলিশের কাছে কোন রেফারেন্স নেই। সাব-ইনস্পেক্টার পদ্মলোচন বাবু থেকে শুরু করে পুলিশ কমিশনার পর্যন্ত লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের শরণাপন্ন হন। জ্যোতি, মানা, তপু ফাইল হাতড়ে ঠিক বলে দেবে কাপ্টেন মালহোত্রা বা মিস-কাম-মিসেস অলকা মণ্ডলের হোল হিষ্ট্রি।

দেবী বল্লো, দেওকীনন্দনবাবু ফি বছর এক একটি সঙ্গিনী নিয়ে পূজার সময় কলকাতা বেড়াতে আসতেন। আর এমনি পোড়া কপাল যে ওকে আমাদের অনুসন্ধান অফিসে আসতেই হতো। আমাদের সঙ্গে ওর দারুণ ফ্রেণ্ডসিপ হয়ে গেল। গতবার দেওকীনন্দনবাবু যখন মিনিস্টার হলেন, তখন আমরা একটা টেলিগ্রাম পাঠালুম, বেস্ট উইসেস ফ্রম পূজা এনকোয়ারি অফিস।' ব্যস, তারপরেই ইনভিটেশন। ক্রীস্টমাসের ছুটিতে আমরা বিনি পয়সায় দেওকীনন্দনবাবুর গেস্ট হয়ে ঘুরে এলুম।

মানা বল্লো, শ্যামলদার মত জার্নালিস্ট আমাদের অনুসন্ধান অফিসে বসলে 'চেঞ্জিং প্যাটার্ন অফ ইণ্ডিয়ান সোস্যাইটি অ্যাণ্ড লাভ' লিখে ফেলতে পারতেন। ছোটভাই বল্লো, আরো পড়ুন। আরো মজা পাবেন। আমাদের হাফ কালেকশনও তো পড়লেন না।

আমি বল্লাম, থ্যাঙ্ক ইউ অল। এবার থেকে দুর্গা পূজার সময় দুর্গাকে না দেখে শুধু অনুসন্ধান অফিস দেখব।

ঘর থেকে পাড়ার মস্তানরা বেরিয়ে যাবার সময় হঠাৎ চিৎকার করে উঠল, মিস মণ্ডল, আপনি যেখানেই থাকুন, সত্বর অনুসন্ধান অফিসে চলে আসুন। মেজর ল্যাজারাস আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।

# তাম্রপত্র

'যোগীনদা, তুমি তাহলে এসেছ?' পাশের চেয়ারে বসতে গিয়েই প্রভাসবাবু জিজ্ঞাসা করলেন।

যোগীনবাবু একটু ম্লান হাসি হাসলেন। বললেন, 'ভেবেছিলাম আসব না, কিন্তু না এসে পারলাম না। আর কিছু না হোক কিছু পুরানো বন্ধু আর সহকর্মীর সঙ্গে দেখা হবার লোভ কিছুতেই সামলাতে পারলাম না।'

প্রভাসবাবুও হাসলেন। ফিসফিস করে বললেন, 'ঐ লোভে পড়েই সবাই এসেছে। তা নয়ত কি জেল খাটার সার্টিফিকেট নিতে কেউ এসেছে?'

বিঠলভাই প্যাটেল হাউসের সম্বর্ধনা সভায় বিপ্লবীরা আসতে শুরু করেছেন। সবাই বৃদ্ধ। শীর্ণ। অনেকের চোখে মোটা কাঁচের চশমা। হাতে লাঠি। কয়েকজন ক্রাচ বগলে দিয়ে এলেন। সব কিছু মিলিয়ে গোধুলির মত বিষণ্ণ। করুণ। কেমন যেন একটা হারিয়ে যাবার সুর, ব্যর্থতার গ্লানি সবার মুখে, কথায় ফুটে উঠেছে। সবাই যেন পরাজিত নায়ক!

'আপ?...' লাঠি ঠকঠক করতে করতে এক বৃদ্ধ যোগীনবাবুর সামনে এসে বিস্ময়ের সঙ্গে তাকালেন।

'আমি যোগীন্দ্রনাথ'...

বুড়ো মানুষ। আর ধৈর্য ধরতে পারলেন না। চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হিজলী জেলের যোগী দাদা?'

বর্ষণক্লান্ত অন্ধকার শ্রাবণ রাত্রিতে যেমন মুহূর্তের জন্য বিদ্যুৎ চমকে উঠে দিনের আলোর ইশারা জানিয়ে যায়, তেমনি মুহূর্তের জন্য যোগীনবাবুর ম্লান মুখে আত্মতৃপ্তির হাসিতে ভরে গেল। 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমিই হিজলী জেলের যোগীদাদা! আপনি ...।'

'আরে, যোগীদাদা, আমি সূর্যনারায়ণ। চিনতে পারেন?'

'তুমি সেই সূর্য?' আর বসে থাকতে পারলেন না যোগীনবাবু। উঠে দাঁড়িয়েই বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন সুরয নারায়ণকে। 'তুমিই তো খড়গপুর স্টেশনে হাডসন সাহেবকে গুলী করেছিলে। তোমাকে কি এত সহজে ভুলতে পারি?'

এবার তুজনে হাত ধরে মুখোমুখি। 'আপনি তাহলে ভোলেন নি আমাকে ?'

'কি যে বল মূর্খ ? ঐ হাডসন সাহেব বিনোদ দারোগাকে দিয়ে আমার বিধবা দিদির সর্বনাশ করায়, আর তুমি সেই হাডসন সাহেবকে গুলী করেছিলে। সে কি আমি জীবনে ভুলতে পারব ?'

'কিন্তু দাদা, আমি তো শালাকে খতম করতে পারলাম না !' দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নিজের ব্যর্থতার গ্লানি প্রকাশ করলেন সুরয নারাযণ।

'তুমি না শেষ করলেও ক্ষিতীশ তো ওকে শেষ করেছিল।'

'দাদা, খেলায জিতলে আনন্দ হয, কিন্তু নিজে গোল দিতে পারলে আরো বেশী আনন্দ হয।'

'তারপর বল তুমি কেমন আছ ?'

'কোন মতে বেঁচে আছি যোগীদাদা।'

'তোমার বাড়ী গয়াতে ছিল না ?'

সুরয নারায়ণ না হেসে পারে না। 'তাও মনে আছে আপনার ?'

হাসলেন যোগীনবাবুও। 'তোমাদের মত পুরানো বন্ধু-বান্ধবদের কথা মনে করা ছাড়া এখন আর আমার কাজ কি ?'

কথা যেন ফুরোতে চায় না। সুরয নারাযণ পাশের চেয়ারে বসেই জিজ্ঞাসা করলেন 'গঙ্গা দিদির কি খবর ?'

যোগীনবাবু চমকে উঠলেন। 'আমি তো ওর কোন খবর জানি না।'

'সে কি ? আপনি গঙ্গাদিদিকে বিয়ে করেন নি ?'

ত্মঃখেও যোগীনবাবু হাসলেন। 'গঙ্গা কি বেঁচে আছে ?'

'বেঁচে নেই ?'

'জানি না। আমি হিজলী জেল থেকে আন্দামান যাবার পর আর ওর খবর পাইনি।'

মন্ত্রী- এম-পির দল এসেছেন। মিটিং, বিপ্লবীদের সম্বর্ধনা সভা শুরু হয়ে গেছে। আগামীকাল বিকেলে লালকেল্লায় তাম্রপত্র দেওয়া হবে স্বাধীনতা সংগ্রামের বরেণ্য যোদ্ধাদের। তিন-চারদিন ধরে সম্বর্ধনা দেওয়া হচ্ছে নানা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে। তার প্রথমটি আজ হচ্ছে। একজন মন্ত্রী মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন। তিন-চার-পাঁচটা লাউড স্পীকারে সে ভাষণ ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে, কিন্তু যোগীনবাবুর কানে কিছু

পৌঁছচ্ছে না। চোখেও আশে-পাশের কোন মানুষকে দেখতে পাচ্ছেন না। হঠাৎ যেন ওর কিছু কিছু ইন্দ্রিয় মরে গেল। মনে পড়ছে শুধু গঙ্গার কথা। চোখের সামনে ভেসে উঠছে ঐ একটি মূর্তি। গঙ্গা।

গঙ্গার বড়দার কাছেই যোগীনবাবু স্বদেশী মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন। এই কিশোরী মেয়েটা এসেই ওকে প্রথম আমন্ত্রন জানায়, 'যোগীনদাদা, বড়দা তোমাকে একবার আশ্রমে যেতে বলেছেন।'

'আমাকে ?'

'হ্যাঁ।'

যোগীনবাবু হাসতে হাসতে বলেছিলেন, 'তোমার বড়দার আশ্রমে গিয়ে কি কীর্তন গাইব ?'

কথাটা শুনে গঙ্গার ভাল লাগে নি। 'গেলে বোধহয় ভালই লাগবে।'

'এই বয়সে ?'

'স্কুলের মেয়ে হয়ে যদি আমার ভাল লাগে তাহলে আপনারও ভাল লাগবে।'

মনে মনে খুশী না হলেও গঙ্গার বড়দার অনুরোধ উপেক্ষা করার সাহস ছিল না যোগীনবাবুর। সারা শহরের মানুষ ওঁকে শ্রদ্ধা করে। একদল স্কুল কলেজের ছেলেমেয়ে তো ওঁকে দেবতার মত ভক্তি করে।

'কবে যেতে বলেছেন ?'

'ভোরবেলায় আমি যখন ফুল দিতে যাব তখন তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাব।'

পরের দিন ভোরবেলায় যোগীনবাবু গঙ্গার সঙ্গেই বড়দার আশ্রমে গেলেন। গঙ্গাকে দেখেই বড়দা জিজ্ঞাসা করলেন, 'হ্যাঁরে, ভাল ফুল পেয়েছিস ?'

আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে গঙ্গা বললো, 'আমার কাছে ফুল চেয়ে কবে তুমি পাওনি বলতে পারো ?'

বড়দা ওর ফোলা ফোলা গাল দুটো টিপে আদর করে বললেন, 'তুই যা করছিস তার তুলনা হয় না গঙ্গা। দেখিস একদিন হয়ত তোর ষ্ট্যাচু তৈরী হবে কলকাতা শহরে।'

শিকারী বেড়ালের মত দুই ভাই-বোনের চারটি চোখ একবার সতর্ক ভাবে চারদিক ঘুরিয়ে আনার পরই গঙ্গা আঁচলের মধ্যে থেকে ছোট একটা রিভলবার বের করে বড়দাকে দিল।

হাবা-বোবা হয়ে যোগীনবাবু দেখলেন। তারপর আপন মনেই বললেন, 'পিস্তল!'

জীবনে, যৌবনের প্রারম্ভে যোগীনবাবু ঐ প্রথম পিস্তল দেখেই প্রায় আধ-মরা হয়ে গিয়েছিলেন। আর ঐ চোদ্দ বছরের মেয়েটা? খেলনার মত আলতো হাতে তুলে দিল বড়দাকে সেটা।

তারপরের কয়েকটা বছরের দিনগুলো যেন নায়েগ্রা জলপ্রপাতের মত ঝড়ের বেগে অমিত বিক্রমে পার হয়ে গেল। কত প্রাণ দেওয়া হলো। কত-জন জেলে গেল, কতজনের ফাঁসি হলো। কত পিস্তল। কত বুলেট!

গঙ্গা জীবন বিপন্ন করে বড়দাকে ভাল ভাল ফুল এনে দিয়েছে, পেঁ ৗছে দিয়েছে এখানে-ওখানে-সেখানে। কেষ্ট সরকারকে যেদিন নর্টন সাহেব গুলী করে মারলেন, সেদিন গঙ্গা এসে কাঁদতে কাঁদতে বড়দার কাছে অনুমতি চাইল, বড়দা তুমি আমাকে একবার অনুমতি দাও! বেশী না, মাত্র দুটো বুলেট খরচ করব। বড়দা অনুমতি দেননি, দিতে পারেন নি, 'নারে গঙ্গা, তা হয় না। তুই ধরা পড়লে আমাকে এসব ভাল ফুল কে এনে দেবে রে?'

তারপর একদিন।

সেই ভোরবেলায় গঙ্গা ফুল দিতে গেছে বড়দার আশ্রমে। মানিক মাইতি ঐ ফুল নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চলে যাবে জজ কোর্টে।

যোগীনবাবু আর্দালীর পোষাক পরে ঠিক সময়ে পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিড়ি খাবেন। মানিক পান কিনতে এলেই আর্দালী আস্তে আস্তে কোর্টের দিকে এগুবে। কাশীনাথ আগে থেকেই কোর্ট রুমে বসে থাকবে। ওরা আসার পরই কাশীনাথ নাকে নস্যি দিয়ে হাঁচতে শুরু করলেই মানিক আর যোগীনবাবু একসঙ্গে পর পর দু'বার···

হৈ চৈ শুরু হলেই কাশীনাথ!

সবকিছু ঠিক, কিন্তু মানিক এলো না। যোগীনবাবু প্রথমে ঘাবড়ে গেলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাজ শেষ না করে অশ্রমে ফিরে যেতে সাহস পেলেন না। প্ল্যানটা একটু অদল বদল করে যোগীনবাবু আরকাশীবাথই একসঙ্গে পিস্তল তুলে ধরলেন জজসাহেবের দিকে। একটি একটি করে মাত্র দুটি বুলেট। জজসাহেব শেষ হলেন। সি-আই-ডি বিনোদ বেরার পেটে বুলেট লাগল। বুলেট লাগল যোগীনবাবুর ডান হাতের কনুইতে কিন্তু বিষ্টু হালুইকরের দোকানের পিছন দিক দিয়ে ওরা দুজনে যে কোথায় উধাও হলো তা পুলিশ দেখতে পেল না।

কলকাতার সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটে এক প্রিন্টিং ওয়ার্কস-এর কম্পোজিং রুমে এসে ওরা জানল নর্টন সাহেবের গুলীতে বড়দা আহত হয়ে জেলে আর মানিক শেষ। গঙ্গা কোথায় পালিয়েছে কেউ জানে না। পরের দিন একটা টেলিগ্রাম এলো, ফ্লাওয়ার সাপ্লায়ার প্রসিডিং বেনারস। বুঝতে অসুবিধা হলো না কারুর যে গঙ্গা বেনারসে দেবনাথপুরার ঐ শিবমন্দিরে যাবে।

ছত্রিশ বছর আগেকার কথা হলেও যোগীনবাবুর সবকিছু মনে পড়েছে। এই ছত্রিশ বছরের প্রতিটি দিনই একবার করে অন্তত মনে পড়েছে গঙ্গার কথা। ইতিহাস। নর্টন সাহেবকে শেষ করার কাহিনী। আরো কত কি! বিবর্ণ বিষণ্ণ মনে ঐ একই চিন্তা বারবার উঁকি দেয়। যোগীনবাবুর রূপ যৌবন চলে গেছে। দেহ জরাজীর্ণ। হরনাথ দারোগার গুলিতে আংশিক পঙ্গু, রোগ-গ্রস্থ। সহায় সম্পদ বলে কিছুই নেই। এক ভাইপোর কৃপায় কোনমতে দিনগত পাপক্ষয় করে চিরকালের জন্য হারিয়ে যাবার অপেক্ষায় রয়েছেন।

মিটিং শেষ হয়ে গেছে। মন্ত্রীদের চারপাশে কিছু মানুষের ভীড়। পুরনো বন্ধু বান্ধবদের কাছে পেয়ে অনেকেই আনন্দে অধীর হয়ে হৈচৈ শুরু করে দিয়েছেন। যোগীনবাবু আপন মনে বসেই আছেন।

'কি হলো যোগীনদা, উঠবে না?' প্রভাসবাবু কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন।

'এই উঠছি ভাই।'

'চল চল তাড়াতাড়ি ওঠো। এক্ষুনি বাস ছেড়ে দেবে।'

'ছাড়ুক।'

'সে কি? তুমি হোম মিনিস্টারের ডিনারে যাবে না?'

উদাস হয়ে যোগীনবাবু বললেন, 'না ভাই, আমি আর ঐসব ডিনারে-টিনারে যাচ্ছি না।'

'কেন যোগীনদা? যাবে না কেন।'

'আমি একটু স্টেশনে যাব।'

'কেন?'

'দেখি কালকের একটা টিকিট পাই কিনা।'

'সেকি? কাল বিকেলে লালকেল্লার ফাংশানে যাবে না?' বোধহয় একটু বিরক্ত হয়েই প্রভাসবাবু জিজ্ঞাসা করলেন।

'ইচ্ছা নেই।'

'ওসব পাগলামী ছাড়ো তো। চল, ওঠ।' প্রভাসবাবু জোর করেই যোগীনবাবুর হাত ধরে টানলেন।

অনিচ্ছা সত্বেও যোগীনবাবু হোম মিনিস্টারের ডিনারে গেলেন। আলাপ হলো অনেকের সঙ্গে। স্বরয নারাযণ একজন ভদ্র-মহিলাকে সামনে এনে জিজ্ঞাসা করলেন, যোগীবাবু একে চেনেন ?

যোগীনবাবু অনেক কষ্ট করেও চিনতে পারলেন না। 'না ভাই চিনতে পারছি না তো ?'

ভদ্রমহিলা একটু হাসলেন। 'আফটার অল উই আর মিটিং আফটার এজেস। চেনা সত্যি সম্ভব নয়।'

স্বরয নারাযণ হাসতে হাসতে বললো, 'আরে যোগীদাদা, এইত গঙ্গাদিদি !'

অস্ফুট স্বরে যোগীনবাবু আপর মনে উচ্চারণ করলেন, 'গঙ্গা !'

'দ্যাটস রাইট যোগীনদা, আমিই গঙ্গা।'

'এতকাল পরে…!'

'আমি তো এখানে ছিলাম না বহুকাল ·

'কোথায় ছিলে ?'

'মিঃ কুট্টির সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও সারা পৃথিবী ঘুরতে হযেছে।'

'কে মিঃ কুট্টি ?'

'এ্যাম্বাসেডর কুট্টি। মাই হাসব্যাণ্ড। এখন অবশ্য রিটায়ার করে কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির ভিজিটিং প্রফেসর !'

'তাহলে ভালই আছ ?'

'মোটামুটি সাম হাউ…!'

স্বরয নারাযণ মাঝপথে বাধা দিযে জিজ্ঞাসা করলেন 'গঙ্গাদিদি আপনিও তো তাম্রপত্র পাচ্ছেন ?'

'দ্যাটস রাইট !'

পরের দিন লালকেল্লার অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতির হাত থেকে সবাই তাম্রপত্র নিলেন, কিন্তু বার বার ঘোষণা করেও যোগীনবাবুকে পাওয়া গেল না।

## স্ত্রী

আইন-আদালতের কলমে একটা মামলার রিপোর্ট পড়েই ক'বছর আগের একটা ঘটনা মনে পড়ল।

পার্লামেন্টের ইলেকশনের আগে রাজস্থানে ঘুরছি। ঘুরতে ঘুরতে এলাম আজমীঢ। সার্কিট হাউসেই উঠেছি। পরদিন খুব ঘুরলাম। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত ঘুরে লুনি নদীর বাঁধে বেড়ালাম অনেকক্ষণ। তারপর সার্কিট হাউসে ফিরে স্নান করলাম। রিপোর্ট টাইপ করলাম। খেলাম। বারান্দায় বসে সিগারেট খেতে খেতে আনা সাগরের শোভা দেখলাম অনেক রাত্রি পর্যন্ত। তারপর ঘুমুতে গেলাম।

পরের দিন সকাল বেলায় বেয়ারার ডাকাডাকিতে যখন ঘুম ভাঙল তখন দেখি বেশ জ্বর হয়েছে। তবু উঠলাম। বারন্দায় চা খেতে বসলাম। হঠাৎ হাতটা কেঁপে চায়ের কাপটা হাত থেকে পড়ে যেতেই বারান্দায় ওপাশ থেকে এক ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি আমার কাছে এগিয়ে এলেন। 'এনিথিং রঙ ?'

শুকনো মুখে একটু কৃতজ্ঞতার হাসি ফোটাবার চেষ্টা করে বললাম, 'নাথিং রঙ, কিন্তু কাল রাত্রে বেশ জ্বর হওয়ায় এখনও বড্ড উইক ফিল করছি। তাই বোধহয় '

মিঃ দাশগুপ্তর সঙ্গে সেই আমার প্রথম আলাপ। পশ্চিমবঙ্গ ক্যাডারের আই-পি-এস। ডেপুটেশনে দিল্লী এসেছেন। একমাত্র মেয়ে বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ী চলে গেছে বলে বাড়ীতে সবাইয়ের মন খারাপ। তাই মা আর স্ত্রীকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন। ভেবেছিলেন পুষ্কর দেখে একদিন আজমীঢে কাটিয়েই চলে যাবেন, কিন্তু আনা সাগরের পারে থাকতে ভাল লাগছে বলে পুরো একটা সপ্তাহ কাটিয়েই দিল্লী ফিরবেন।

শরীরটা ভাল না থাকায় আমিও কদিন আজমীঢ়ে রইলাম। মিঃ দাশগুপ্তর স্ত্রী আর মা দুবেলা পুষ্কর যেতেন ব্রহ্মার মন্দিরে পুজা দিতে আরতি দেখতে, আমরা দুজনে সার্কিট হাউসের বারান্দায় বসে বসে গল্প করতাম। নানা-রকমের গল্প। আমি পার্লামেণ্টের আড্ডাখানার গল্প বলতাম, ভি-আই-পিদের কথা বলতাম। উনিও অনেক মজার মজার ঘটনা, বিচিত্র কাহিনী শোনাতেন।

ইতিমধ্যে সদ্যবিবাহিত এক দম্পতি একদিনের জন্য সার্কিট হাউসে উঠলেন।

'ইয়াং কাপল দেখলেই আমার একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে।' জানালা সাগরের দিক থেকে দৃষ্টিটা আমার দিকে ঘুরিয়ে এনে মিঃ দাশগুপ্ত বললেন।

'কি হয়েছিল? বিয়ে না করেই বুঝি স্বামী-স্ত্রীর মতন সংসার পেতেছিল?'

উনি হাসলেন। 'এতো হামেশাই ঘটছে।

'তবে?'

মিঃ দাশগুপ্ত শুরু করলেন, 'আমি তখন মেদিনীপুরে। কয়েক মাসের মধ্যে দীঘাতে অনেকগুলো ঘটনা ঘটে গেল বলে আমি নিজেই একবার ওখানে গেলাম।'

'তারপর?'

'দু-তিনদিন পরে একজন ইয়াং ছেলে আমার সঙ্গে দেখা করতে এলো।'

'নমস্কার। একটু জরুরী এবং ব্যক্তিগত কারণে আপনাকে এই অসময়ে বিরক্ত করতে এলাম।'

মিঃ দাশগুপ্ত একবার ভাল করে ছেলেটাকে দেখে নিয়ে বললেন, 'বসুন।'

উনি বসতেই মিঃ দাশগুপ্ত জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার নাম?'

'আমার নাম শিশির সরকার।'

'বলুন কি ব্যাপার।'

দু এক মিনিট শিশিরবাবুর মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুল না। পাথরের মত চুপ করে রইলেন। তারপর হঠাৎ বললেন, 'আমার স্ত্রী হারিয়ে গেছেন।'

দীঘা কলকাতা দিল্লী বোম্বের মত বিরাট শহর নয় যে ভুল করে একটু এদিক ওদিক গেলেই সদ্য আগত ছেলে মেয়েরা হারিয়ে যাবে। হোটেলে বা বাংলোয় খাওয়া-দাওয়া আর বিশ্রাম করা ছাড়া সমুদ্র পারেই সবাই বেড়াতে যান। এছাড়া ঝাউবনের আশেপাশেও অনেকে একটু আধটু ঘোরাঘুরি করেন, কিন্তু হারিয়ে যাবার জায়গা কোথায়? শিশিরবাবুর কথা শুনে মিঃ দাশগুপ্ত বেশ অবাক হলেন। বললেন, 'এখানে হারিয়ে যাবে কোথায়?'

শিশিরবাবু শূন্য দৃষ্টিতে একবার মিঃ দাশগুপ্তর দিকে চাইলেন। 'কিন্তু সকাল থেকেই তো তাকে পাচ্ছি না।'

'সকাল থেকে মানে?'

'আমি আটটা নাগাদ ঘুম থেকে ওঠার পর থেকে আর ওকে পাচ্ছিনা।'

'কোথায় উঠেছেন ?'

'ডেভেলপমেণ্ট ডিপার্টমেণ্টের বাংলোয়।'

'কবে এখানে এসেছেন ?'

'আজ ঠিক এক সপ্তাহ হয়ে গেল।'

'আপনার স্ত্রীর নামটা জানতে পারি ?'

'অঞ্জলি সরকার।'

'কতদিন হলো আপনাদের বিয়ে হয়েছে ?'

'এখনও এক মাস হয়নি।'

'এখানে হনিমুনে এসেছেন ?'

'তা বলতে পারেন।'

'নিজেরাই পছন্দ করে বিয়ে করেছেন ?'

'না। নিগোসিয়েটেড ম্যারেজ।'

মিঃ দাশগুপ্ত একটু ভাবেন। টুরিষ্ট সীজনে অনেক আজেবাজে লোক দীঘা আসে নানা মতলবে। দীঘা যতবেশী জনপ্রিয় হচ্ছে ততবেশী আজে-বাজে ঘটনাও ঘটছে, কিন্তু হনিমুনে এসে স্ত্রী উধাও ? 'আপনার স্ত্রীকে দেখতে কেমন ?'

'ভাল।'

'বিয়ের আগে কাউকে ভালবাসতেন কিনা জানেন ?'

'সেসব তো কিছু বুঝতে পারিনি।'

'বিয়ের পর থেকেই আপনারা তুজনে একসঙ্গে কাটিয়েছেন ?'

'হাঁ।'

'আপনার স্ত্রী আপনার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতেন ?'

'খুব ভাল।'

'এর মধ্যে কোন ঝগড়াঝাঁটি হয়েছে নাকি ?'

'না।'

'কোন বিষয়ে মত বিরোধ ?'

শিশিরবাবু মাথা নেড়ে বললেন, 'কই না তো।'

মিঃ দাশগুপ্ত বললেন, 'বাই দা ওয়ে, কত টাকা বা কি কি গয়না নিয়ে গিয়েছেন বলতে পারেন ?'

শিশিরবাবু তাড়াতাড়ি মাথা দোলাতে দোলাতে বললেন, 'না না, ও সে ধরনের মেয়ে না।'

'তবুও কি কি নিয়ে গিয়েছেন?'

'গলায় একটা সামান্য চেন আর হাতের কয়েক গাছা চুড়ি ছাড়া ওর সব গয়নাই আমার মার কাছে আছে।'

'তাহলে গলার ঐ চেন আর হাতের চুড়ি পরেই উনি গিয়েছেন?'

'না, ওর গলার চেনটা ওর বালিশের নীচে ছিল।'

'কেন?'

'রাত্রে শোবার সময় রোজই ওটা খুলে শুতো।'

'টাকাকড়ি?'

'না, না, কোন টাকা পয়সা নিয়ে যায় নি।'

'জামা-কাপড়?'

'সবই পড়ে আছে।'

একজন সিনিয়র পুলিশ অফিসের মনে আরো অনেক প্রশ্ন আসে।

'আপনি কি করেন?'

'আমি সিভিল ইঞ্জিনীয়ার, পি-ডবলিউ ডিতে চাকরি করি।'

'আপনার স্ত্রী কতদূর লেখাপড়া করেছেন?'

'ও বি-এ পাশ।'

'দেনা পাওনা নিয়ে আপনাদের বাড়ীতে আপনার স্ত্রীকে কোন কথা শুনতে হয়েছে?'

'বরং ওরা যা দিয়েছে আমরা এত আশা করিনি।'

'বিয়ের আগে আপনি কাউকে ভালবাসতেন?'

'না।'

'কোন মেয়ের সঙ্গে চিঠিপত্রের লেন দেন ছিল?'

'না।'

মিঃ দাশগুপ্ত নতুন একটা সিগার ধরাতে ধরাতে কি যেন হিসাব-নিকাশ করে নিলেন। 'ইফ ইউ ডোণ্ট মাইণ্ড, আপনার কোন ফিজিক্যাল ডিস-এবিলিটি আছে কি?'

'নট দ্য লিষ্ট!'

কয়েক মিনিট দুজনেই চুপচাপ বসে রইলেন। তারপর মিঃ দাশগুপ্ত

বললেন, 'দীঘাতে হারিয়ে যাবার কোন স্কোপ নেই, তা তো ঠিক ?'

'দ্যাটস রাইট।' মাথা নীচু করে শিশিরবাবু বললেন।

'আই হোপ সী হ্যাজ নট মেট উইথ এনি এ্যাকসিডেণ্ট।'

শিশিরবাবু বললেন, 'ভোরবেলায় মর্নিং ওয়াক-এ বেরিয়ে তো কোন এ্যাকসিডেন্ট হবার কথা নয়।'

'উনি কি রোজ ভোরবেলায় বেড়াতে যেতেন ?'

'হ্যাঁ।'

'কটার সময় যেতেন ?'

'ঠিক টাইমটা বলতে পারব না, তবে খুব ভোরে যেতো।'

'আপনি ঘুমিয়েই থাকতেন ?'

'হ্যাঁ। ও বেড়িযে এসে স্নান করার পর আমাকে ডাকতো।'

আজমীঢ় সার্কিট হাউসের বারান্দায় বসে বসে শিশির সরকারের স্ত্রী হারাবার গল্প শুনেছি। মিঃ দাশগুপ্ত বললেন, 'ওসব কেস ডিটেক্ট করা কিছু কঠিন নয়। আই ওয়াজ সিওর ইট ওয়াজ নট এ কেস অফ কিডন্যাপিং, নট এ কেস অফ সুইসাইড অর মার্ডার অর মিশিং।

'তাহলে ?' আমি প্রশ্ন করি।

'অন্য কিছু। সমস্ত হোটেলগুলোর রেজিষ্টার থেকে জানতে পারতাম ঐদিন সকালে কারা হোটেল ছেড়ে চলে গেছেন। হোটেলগুলোর লোকজনকে একটু ক্রশ করলেই বেরিয়ে যেতো কে হঠাৎ চলে গেছেন…।'

'দ্যাটস রাইট।'

সকাল বেলায় যেসব বাস ট্যাক্সি দীঘা ছেড়েছে, তাদের কাছে খোঁজ করলেও অনেক কিছু জানা যেতো। খুব বেশী হলে কিছু লোকজনের বাড়ীতে গিয়ে খোঁজ খবর করলেই সব খবর বেরিয়ে পড়তই। কিন্তু আমি কিছুই করলাম না…।

'কেন ?'

'ঠিক কেন তা বলতে পারব না। তবে মনে হলো একটু অপেক্ষা করেই দেখা যাক মিসেস সরকার ফিরে আসেন কিনা। শুধু থানার ও.সি.কে ডেকে সব কিছু জানিয়ে রাখলাম।

'তারপর ?'

মিঃ দাশগুপ্ত একটু হাসলেন। 'রাত সাড়ে আটটা-নটা নাগাদ কণ্টাই রোডের এক বাস ড্রাইভার থানায় এসে দুটো চিঠি দিয়ে গেল।

'দুটো চিঠি ?'

'একটা থানার ও-সিকে লেখা আর একটা মিঃ সরকারকে লেখা।'

'মিসেস সরকারের চিঠি ?'

'হ্যাঁ। কণ্টাই রোড-এ নেমে ড্রাইভার-এর হাতে চিঠি দুটো একটু বেশী রাত্রে পৌছে দিতে বলেছিলেন।'

'কি লিখেছিলেন তাতে ?'

'চিঠিটা পড়তে চান ?'

'আপনার কাছে চিঠিটা আছে নাকি।'

'না চিঠিটা নেই। চিঠিটা মিঃ সরকারকেই দিয়েছিলাম, কিন্তু দেবার আগে আমার পার্সোন্যাল ডায়েরীতে টুকে রাখি।'

'সে ডায়েরী কি দিল্লীতে ?'

'বোধহয় নিয়ে এসেছি।' মিঃ দাশগুপ্ত আবার একটু হাসলেন। 'বাইরে বেরুলেই দু-চারটে লুকোনো ডায়েরী পড়তে বেশ ভালই লাগে।'

'তা তো লাগবেই।'

মিঃ দাশগুপ্ত উঠে গিয়ে ঘর থেকে ডায়েরীটা বের করে এনে আমাকে দিলেন, 'নিন পড়ুন।'

হাত বাড়িয়ে ডায়েরীটা নিয়ে চিঠিটা পড়লাম—'আমি অঞ্জলি। তোমার অঞ্জু। তোমাকে এই আঘাত দেবার কোন ইচ্ছা বা পরিকল্পনা আমার ছিল না, কিন্তু তবু দিতে বাধ্য হলাম। তুমি আমাকে ক্ষমা করো। আমি জানি ঘুম থেকে উঠে তুমি আমাকে খুঁজেছো, ভেবেছো, কিন্তু ভোর বেলায় বেড়াতে বেরিয়ে অপ্রত্যাশিত ভাবে এমন একজনের দেখা পেলাম যে তাকে আর শূন্য হাতে ফিরিয়ে দিতে পারলাম না। সেই স্কুলে পড়ার সময় থেকে আমাদের পরিচয়। বোধহয় ভালবাসাও। আমি জানিনি বুঝিনি ও আমাকে কতটা ভালবাসে। কোনদিন কিছু দাবী করা তো দূরের কথা মুখ ফুটে কিছু বলেনি। আজ ভোরবেলায় হঠাৎ ওকে দেখে চমকে উঠলাম। শুনলাম আজ এক মাস ধরে বাড়ীর বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শরীরের অবস্থা অত্যন্ত কাহিল। এভাবে পাগলের মত ঘুরে বেড়ালে ও নিশ্চয়ই বেশী দিন বাঁচতো না।'

ডায়রীর পাতা ওল্টালাম।

'তোমার বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই। স্বামী হিসাবে তুমি আমাকে সব কিছু দিয়েছো। স্ত্রী হিসেবে আমিও তোমাকে অপূর্ণ রাখিনি। আমি তোমাকে যা দিয়েছি অন্য অনেক মেয়েই তোমাকে তা দিতে পারবে! মোটামুটি যে কোন শিক্ষিতা সুন্দরী, যুবতীকে স্ত্রী হিসেবে পেলেই তোমার মন ভরবে। কিন্তু যে নিঃস্ব কেরানীর সঙ্গে আমি যাচ্ছি, সে শুধু আমাকেই চায়। পৃথিবীর আর কোন মেয়েকে দিয়ে তার অভাব পূর্ণ হবে না।

জানি তোমার অনেক সমস্যার সৃষ্টি করলাম। কলকাতায় ফিরে বলো, আমি সমুদ্রে ডুবে গেছি। তোমার বাবা মা নিশ্চয়ই তোমার আবার বিয়ে দেবেন। আমিও অনুরোধ করছি তুমি বিয়ে করো। বিয়ে না করে তুমি থাকতে পারবে না। আমাদের বাড়ীতেও একটা খবর দিও। দু-চারদিন কান্নাকাটি হবে, কিন্তু তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে।'

আবার ডায়েরীর পাতা ওল্টালাম।

'সব শেষে একটা অনুরোধ। তুমি সরকারী অফিসার। থানা পুলিশ করলে নিশ্চয়ই একদিন না একদিন ধরা পড়ব। লক্ষীটি থানা-পুলিশে রিপোর্ট করো না। মামলা-মোকর্দমা করার মত অর্থের জোর আমাদের নেই।'

ডায়েরীটা বন্ধ করতেই মিঃ দাশগুপ্ত জিজ্ঞাসা করলেন, 'চিঠিটা পড়লেন?'

'হ্যাঁ, কিন্তু এরপর কি হলো?'

'মিঃ সরকার সত্যিই কোন রিপোর্ট করলেন না। আমাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে গেলেন।'

'দেন হোয়াট নেক্সট্?'

'পরের দিনই উনি কলকাতা ফিরে গেলেন।'

'তারপরে ওদের আর কোন খোঁজ খবর পাননি?'

'কয়েক বছর পরে আমি যখন দার্জিলিংএ পোস্টেড হলাম, তখন মিঃ সরকার ওখানে একসিকিউটিভ এঞ্জিনায়ার ছিলেন।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'উনি আবার বিয়ে করেছিলেন?'

'না।'

'আমি অবাক হলাম, 'বিয়ে করেননি ?'

'বিয়ে করা তো দূরের কথা, প্রত্যেকটা ঘরে তিনটে-চারটে করে স্ত্রীর ফটো ছিল।'

'রিয়েলি ?'

'মিঃ দাশগুপ্ত হাসলেন। 'শুনলে অবাক হবেন, প্রত্যেক বছর বিজয়া নববর্ষ আর মিঃ সরকারের জন্মদিনে অঞ্জলি ওকে প্রণাম জানিয়ে চিঠি লিখতো।'

# মানিক

ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই টেলিফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলতেই শুনলাম, 'বলতো কে কথা বলছি?'

একটু ভেবেও ঠিক ধরতে পারলাম না। বুঝলাম যারা নিয়মিত টেলিফোন করেন, তাদের কেউ না। বললাম, 'ঠিক ধরতে পারছি না।'

ওপাশ থেকে একটু হাসির আওয়াজ এলো। 'আমি মানিক। চিনতে পারছিস?' এক মুহূর্তের মধ্যে ভেবে নেবার চেষ্টা করলাম। মানিক? মানিক চ্যাটার্জী? নাকি মানিক ঘোষ? কিন্তু ওরা তো এভাবে কথা বলবেন না। তবে কোন্ মানিক?

'কিরে, চিনতে পারছিস না?'

নিশ্চয়ই খুব পরিচিত, ঘনিষ্ট। তা না হলে—

আমার নীরবতা ও আর সহ্য করতে পারে না। 'ওরে আমি মানিক বোস। একসঙ্গে রিপন স্কুলে—'

ওকে আর বলতে হলো না। অনেক কাল আগেকার কথা হলেও সব কথা মনে পড়ল। আমি হাসতে হাসতে বললাম, 'সোনার মানিক?'

মানিক হাসল। 'তাহলে মনে আছে দেখছি।'

'ভুলে যাব মানে? তোর জন্যে গুরুদাসবাবুর কাছে কি কম বকুনি খেয়েছি?'

'তোর সে-সব কথাও মনে আছে?'

আমি, জ্যোতি, প্রতাপ, দিবাকর, প্রণব, নিতাই, গুরুপ্রসাদ ও আরো দু-তিনজন বরাবর রিপন স্কুলে পড়েছি। মানিকও তাই। জ্যোতি ইংরেজীতে সব চাইতে বেশী নম্বর পেত, নিতাই অঙ্কে চিরকাল ফুল মার্কস পেত, প্রতাপ ছিল অলরাউণ্ডার, ইংরেজী, বাংলা, অঙ্ক, সংস্কৃত—সবতাতেই বেশ ভাল। আর মানিক? প্রত্যেকবার সেকেণ্ড অথবা থার্ড। তাছাড়া দারুণ ফুটবল খেলত। ক্লাস নাইনে উঠেই মানিক স্কুল টিমের ক্যাপ্টেন হল, আর সেইবারই তিন বছর পর আমাদের স্কুল ইন্টার-স্কুল চ্যাম্পিয়ান হল। পরের দিন স্কুল ছুটি। ছুটির পর হাজার ছেলের সামনে যখন মানিক বিরাট শীল্ডটা হাতে করে

দাঁড়াল তখন আমরা গলা ফাটিয়ে চীৎকার করেছিলাম, 'থ্রী চিয়ার্স' ফর কাপ্টেন মানিক বোস !'

'হিপ, হিপ, হুররে !'

'হিপ্, হিপ্, হুররে !'

'হিপ্, হিপ্, হুররে !'

মনে আছে স্কুল-টিমকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তৃতা দেবার সময় হেডমাষ্টার কামিনী ঘোষ মানিককে 'সোনার মানিক বলেছিলেন। ব্যাস ! সেই থেকে ওর নাম হয়ে গেল সোনার মানিক।'

আমরা অনেকেই রিপন কলেজে ভর্তি হলাম। মানিক ভর্তি হল সেণ্ট জেভিয়ার্সে। বিশেষ দেখাশুনা হত না, কিন্তু মাঝে মাঝে এর-ওর কাছে খবর পেতাম। তারপর আস্তে আস্তে আমরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়লাম। মানিকের খবর পাওয়াও বন্ধ হল। অনেক কাল আগে একবার শুনেছিলাম ও ক্যালকাটা পুলিসের সাব-ইন্সপেক্টর হয়েছে। তখন আমি সাব-ইন্সপেক্টর বা ইন্সপেক্টর দেখে চিনতে পারতাম না বলে কলকাতার রাস্তায় পুলিসের দারোগা দেখলেই হাঁ করে চেয়ে দেখতাম মানিক কিনা। দারোগা মানিক বোসের সঙ্গে কোন-দিনই আমার দেখা হয় নি। এরও বেশ কয়েক বছর পরে জ্যোতির কাছে শুনেছিলাম মানিক আই-এ এস হয়েছে।

কোন খবরই ঠিক পাকা ছিল না। সবই শোনা কথা। যারা আমাকে এসব খবর দিয়েছে তারাও অন্যের কাছে এসব খবর জেনেছে। আমরা কেউ মানিকের দেখা পেতাম না। মানিক হারিয়ে গেল, কিন্তু তবু মাঝে মাঝেই মনে পড়ত। ছোটবেলার কথা, স্কুল জীবনের কথা মনে পড়লেই অনেক স্মৃতির ভীড় ঠেলে সোনার মানিক সামনে হাজির হত।

সেই মানিক !

এক নিশ্বাসে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করলাম, 'কোথা থেকে ফোন করছিস ? কেমন আছিস ? কি করছিস ?"

বুঝলাম মানিক হাসছে। বলল, 'এত কথা কি টেলিফোনে বলা যায় ? বল কখন দেখা হবে।'

'তুই দিল্লীতেই আছিস ?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায় ?'

'ওয়েলেসলি রোডে।'

বুঝলাম জ্যোতির খবরটাই ঠিক। মানিক নিশ্চয়ই আই-এ-এস হয়েছে। তা না হলে ওয়েলসলি রোডে থাকত না। শুধু জিজ্ঞাসা করলাম, 'কোন মিনিস্ট্রীতে আছিস?'

'ডিফেন্স।'

'বিয়ে করেছিস তো?'

'তুই বিয়ে করিস নি বলে কি আমিও করব না?'

'তা তো বলিনি।'

'এতকাল বিয়ে না করে থাকা যায়?'

সেদিনই রাত্রে ওর ওখানে খেতে গেলাম। গাড়ি থেকে লনে পা দিতে না দিতেই মানিক প্রায় দৌড়ে এসে আমাকে অভ্যর্থনা করল। আমার আপাদমস্তক একবার ভাল করে দেখে বলল, 'যা ভেবেছিলাম, তুই প্রায় সেই রকমই আছিস।'

মানিক অনেক পাল্টে গেছে। বেশ মোটা হয়েছে। চুলগুলো পাতলা হয়ে গেছে। মুখে পাইপ। তাছাড়া দেখেই বোঝা যায় বেশ শৌখীন। আমি হাসতে হাসতে বললাম, 'অভাবনীয় ঘটনা কি সবার জীবনেই ঘটে?'

মানিক আমার কাঁধে একটা হাত দিয়ে বলল, 'বাজে বকিস না, চল চল ভেতরে চল।'

বারান্দা পার হয়ে ড্রইংরুমে ঢুকতেই মানিক ওর স্ত্রীকে ডাকল, 'বন্যা।'

আমি একটু হাসলাম।

'হাসছিস কেন?'

'খেলোয়াড় মানিকও তাহলে অমিত রায় হয়!'

'ওর নাম যে লাবণ্য।'

সোফায় বসতে বসতে বললাম, 'সব লাবণ্যই কি বন্যা হয়?'

একটু ত্বরিত পদক্ষেপেই লাবণ্য ঘরে ঢুকে সোজা আমার সামনে এসে দু'হাত জোড় করে বললেন, 'মাপ করবেন। স্নান করছিলাম।'

আমি উঠে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করলেও নমস্কার করলাম না। বললাম, 'ভালই করেছেন। হঠাৎ লাবণ্যের বন্যা এলে নিশ্চয়ই সামলাতে পারতাম না।'

ওরা দুজনেই হাসল। হাসি থামলে মানিক ওর স্ত্রীকে বলল, 'এর একটা বিয়ে দিতে পার?'

আমি লাবণ্যকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এখন কি একটু গল্প-গুজব করব, নাকি এখুনি বিয়ে করতে যেতে হবে ?'

লাবণ্য হাসল। 'বসুন, বসুন। বলুন কি খাবেন ?' আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই আবার প্রশ্ন, 'একটু হুইস্কি দিই ?'

মানিক বসে বসেই বলল, 'এ আবার জিজ্ঞাসা করার কি আছে ?'

'তোমার মত সবাই যে হুইস্কি ভালবাসবেন তার কি মানে আছে ?'

মানিক পাইপ টানতে টানতে একটু থামল। 'হুইস্কি আর সুন্দরী মেয়ে ভালবাসে না, এমন পুরুষ তুমি দেখেছ ?'

লাবণ্য হাসল, আমাকে দেখল, মানিককে দেখল। ভিতরে চলে গেল। আমি ওর চলে যাবার পথের দিকেই চেয়ে রইলাম।

লাবণ্য সুন্দরী তো বটেই, তাছাড়াও আরো কিছু। অনেক কিছু। কিছু দেবার আগেই অনেক কিছু কেড়ে নেয়। সহজে, অনায়াসে। চোখ দুটো একটু ছোট হলেও এমন মোহময় যে দেখলেই ভাল লাগে। আচ্ছন্ন করে দেয় মন। বোধহয় দুর্ব্বলও। দৃষ্টিটা গুটিয়ে আনলাম। মানিককে বললাম, 'তুই তাহলে সব ব্যাপারেই আমাদের সবাইকে হারিয়ে দিলি ?'

ও ন্যাকামী করে বলল, 'তার মানে ?'

আমি হাসতে হাসতে বললাম, 'তোর আবার হুইস্কি খাবার কি দরকার ? যা পেয়েছিস তাতে তো হুইস্কি খেয়ে নেশা করার দরকার নেই।'

'ফাইন দেশী ধুতি, সিল্কের পাঞ্জাবি পরে, গলায় মালা না দিয়ে কি ফুলশয্যা জমে ?' মানিক হাসল, 'দু-এক পেগ খাবার পরই তো।'

লাবণ্য সামনে, পিছন পিছন চাকর ড্রইংরুমে এলো। দুটো ড্রিঙ্কস আমাদের দিল। নিজে একটা টমেটো জুস নিয়ে পাশের সোফায় বসল। শুরু হল গল্প ! আমাদের স্কুলের গল্প, বন্ধুদের গল্প, আমার কথা, ওর কথা। জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুই কি কোনদিন ক্যালকাটা পুলিসে ছিলি ?'

'মাস আষ্টেক চাকরী করেছিলাম।'

'তাহলে ঠিক খবর পেয়েছিলাম।'

'কেউ বলেছিল বুঝি ?'

'হ্যাঁ, কে যেন বলেছিল। তারপর জ্যোতির কাছে খবর পেলাম তুই আই-এস হয়েছিস।'

'কোন জ্যোতি ?'

'জ্যোতি মুখার্জী।'

'রজনী গুপ্ত রো'র ঐদিকে থাকত ?'

মানিক ঠিক ধরেছে। বললাম, 'হ্যাঁ ঠিক ধরেছিস।'

লাবণ্য আমাদের খালি গ্লাস দুটো ভরে দিয়ে নাটস এর প্লেটটা এগিয়ে দিল। আবার সোফায় বসল। বলল, 'জানেন তো আপনার টেলিফোন নাম্বার আমিই জোগাড় করে দিয়েছি ?'

'তাই নাকি ?'

মানিক বলল, 'আমি অনেক কাল ধরেই তোকে খুঁজছিলাম, কিন্তু কিছুতেই ঠিকানা যোগাড় করতে পারছিলাম না।'

'তারপর ?'

'তারপর আর কি ? কোন এক মেয়ের কাছ থেকে ও তোর টেলিফোন নম্বর নিয়ে এলো।'

লাবণ্যর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কোন্ মেয়ের কাছ থেকে আবার আমার ঠিকানা পেলেন ?'

লাবণ্য হাসল। 'ব্যাচেলার জার্নালিস্টের ঠিকানা কি একজন মেয়ের কাছে থাকে ?'

আমি বললাম, 'না তা থাকে না। অনেক বিগতযৌবনা, বৃদ্ধা পলিটিসিয়ানের কাছেও আমার ঠিকানা পেতে পারেন।'

লাবণ্য বলল, 'অত হতাশ হবার কারণ নেই। যার কাছ থেকে ঠিকানা পেয়েছি তিনি বিগতযৌবনা নন।'

'বিগতযৌবনা না হলেও তাকে নিশ্চয়ই বলতে পারব না –

'জীবন আঁধার হল, সেইক্ষণে পাইনু সন্ধান—'
সন্ধ্যার দেউলদীপ চিত্তের মন্দিরে তব দান।'

আমার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই মানিক চীৎকার করে বলল, 'শেষের কবিতার কবিতাগুলো তোর মুখস্ত আছে ?'

বললাম, 'মুখস্থ নেই, তবে তোর বন্ধাকে দেখে লাবণ্যর অনেক কিছুই মনে পড়ছে। লাবণ্য জিজ্ঞেসা করল, 'এবার আপনার কথার জবাব দিতে পারি ?'

'নিশ্চয়ই।'

'চিত্তের মন্দিরে সন্ধ্যার দেউলদীপ না জ্বালালেও অন্তত বলতে পারবেন—

'অতীতের তীর হতে যে রাত্রে বহিবে দীর্ঘশ্বাস,

ঝরা বকুলের কান্না ব্যথিবে আকাশ,
সেইক্ষণে খুঁজে দেখো, কিছু মোর পিছে রহিল সে
তোমার প্রাণের প্রান্তে——'

লাবণ্যকে আর এগুতে না দিয়ে বললাম, 'সম্ভাবনা কম।'

মানিক গেলাসে শেষ চমুক দিয়ে বলল, 'লাগাও আর এক রাউণ্ড!'

আমি বললাম, 'আমাকে দেবেন না।'

'কেন? কি হল?' লাবণ্য জিজ্ঞাসা করল।

মানিক বলল, 'আরে খা খা! এত কাল পরে দেখা হল, লেট আস এনজয়।'

'তোর আর ভয় কি? বন্যা তোকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে, কিন্তু আমি? আমাকে তো বাড়ি ফিরতে হবে।'

অনেক বার অনুরোধ করেও ফল হল না। আর এক রাউণ্ড নিতেই হল। তারপর মানিক বলল 'ওয়ান ফর দ্য রোড!'

'তাহলে সত্যি সত্যি রাস্তায় পড়ে থাকতে হবে।'

বেশ কেটে গেল সেদিনের সন্ধ্যা রাত্রি। এমন আনন্দে কাটল আরো অনেক দিন। সন্ধ্যা। রাত্রি। যখন তখন ওদের ওখানে যেতাম। হাজার হোক বাল্যবন্ধু। তারপর লাবণ্য! বন্যা! গল্প করেছি, খেয়েছি, একসঙ্গে বেড়াতে গেছি। ফিরোজ শা কোটলা, বুদ্ধ-জয়ন্তী পার্ক। দু' তিনবার দিল্লীর বাইরেও গেছি। ভরতপুর বার্ড স্যাংচুয়ারি, মুসৌরী। মানিক প্রত্যেক মাসেই দু'চার দিনের জন্য টুরে যেত। তখনও গেছি।

তারপর একদিন মানিক আমেদাবাদ চলে গেল। গুজরাত ক্যাডারের আই-এ-এস-কে গুজরাত সরকার ফিরিয়ে নিল। এরপর আর মানিকের সঙ্গে দেখা হয় নি। দু'তিন বছর পরে জ্যোতির কাছেই শুনলাম, মানিক সরকারী চাকরীতে ইস্তাফা দিয়ে একটা প্রাইভেট ফার্মের ওভারসিস ম্যানেজার হয়ে লণ্ডন চলে গেছে।

মাস দুই আগে রাজধানী এক্সপ্রেসে দিল্লী আসছি। আমার পাশে দুটি ছেলে বসেছে। দুই ভাই। কখনও বই পড়ছে, কখনও গল্প করছে। একটা ক্যাডবেরি কিনে দুজনে ভাগ করে খেলো। আমি মাঝে মাঝেই ওদের দেখছিলাম। বেশ লাগছিল ওদের দেখতে। টুক-টাক কথাবার্তা বললেও ভাল করে আলাপ করলাম রাত্রে ডিনারের সময়।

'তোমার নাম কি?' বড় ভাইকে জিজ্ঞাসা করলাম।

'তীর্থঙ্কর বসু।'

'বাঃ বেশ নাম।' এবার ওর ছোট ভাইকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আর তোমার নাম?'

'তথাগত বসু।'

'ভারী সুন্দর নাম তো তোমাদের?'

ওরা চুপ করে রইল। আবার প্রশ্ন করলাম, 'তোমরা দিল্লীতে থাকো?'

বড় ভাই জবাব দিল, 'না' আমরা কলকাতাতেই থাকি।'

'দিল্লী বেড়াতে যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ।'

'তোমরা দুজনেই যাচ্ছ?'

'না, মাও যাচ্ছেন।'

ছোট ছেলেটি উঠে দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে ইশারা করে বলল, 'ঐ তো লেডীজ সীটে মা বসে আছেন।'

খাওয়া-দাওয়ার পর আবার গল্প শুরু হল। জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমার বাবা বুঝি ছুটি পেলেন না?'

'বাবা অন্য জায়গায় থাকেন।'

'কি করেন তোমার বাবা?'

'আমার বাবা আই-এ-এস, কিন্তু চাকরী ছেড়ে দিয়েছেন।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'কি নাম তোমার বাবার?'

'শ্রী মানিকলাল বসু।'

দারুণ উত্তেজিত হয়ে বললাম, 'তোমরা মানিকের ছেলে?'

ওরা দুই ভাই প্রায় একই সঙ্গেই জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি বুঝি বাবাকে চেনেন?'

'তোমার বাবা আমার স্কুলের বন্ধু—'

'তাই নাকি?'

'তবে কি? আমরা ক্লাস টু থেকে একেবারে ম্যাট্রিক পর্যন্ত একসঙ্গে পড়েছি—'

গাড়ির আলো অফ্ হল। জ্বলে উঠল নিষ্প্রভ নাইট ল্যাম্পগুলো।

একজন ভদ্রমহিলা একটা মোটা চাদর নিয়ে এগিয়ে আসতেই তথাগত বলল, 'মা ইনি বাবার ক্লাস-ফ্রেণ্ড।'

ভদ্রমহিলা হাত জোড় করে নমস্কার করলেন।

আমিও নমস্কার করলাম।

'আপনিও রিপন স্কুলে পড়তেন ?'

'হ্যাঁ।'

'ফুটবলও খেলতেন নাকি ?'

'না'।

ভদ্রমহিলা চাদরটা দুই ছেলের গায়ে দিয়ে বললেন, 'চলি। কাল আবার কথা হবে।'

'আচ্ছা।'

মনে মনে ভাবলাম হেডমাস্টার কামিনী ঘোষ কামিনী চিনতেন না বলেই ওকে সোনার মানিক বলতেন।

# বোকার মা

ঠাকুরপো, তাড়াতাড়ি উঠে পড়। বোকার মা'র আসার সময় হয়ে গেছে।

চায়ের কাপ নিয়ে ঘরে ঢুকতে ঢুকতেই অঞ্জলি ডাকলেও ঠাকুরপো নিরুত্তর। এবার চায়ের কাপ টেবিলের পর রেখে অঞ্জলি অজয়ের উপর ঝুঁকে পড়ে ডাকল, ও ঠাকুরপো, উঠবে না? অনেক বেলা হয়ে গেছে। ওঠো ভাই, বোকার মা এলো বলে।

অজয় উপুড় হয়ে শুয়ে থাকলেও ঘুমুচ্ছিল না। হঠাৎ ঘুরে শুয়েই খপ করে অঞ্জলির হাত ধরে বললো, দাদা বাইরে গেছে বলে তোমার না হয় ঘুমের ব্যাঘাত হয় নি, কিন্তু আমি তো সারা রাত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভোরের দিকে একটু ঘুমোই। তোমার বোকার মার জ্বালায় কি···

হয় স্লিপিং পিল কিনে আনো নয়ত শিউলিকে নিয়ে এসো। তোমায় হা হুতাশ আর সহ্য হয় না।

তা তো বটেই।

তোমার সব দুঃখের কথা পরে শুনব। এবার ওঠো। বোকার মা এলে···

আবার বোকার মা।

১. সঙ্গে সঙ্গে দরজার ওপাশ থেকে ভাঙা কাঁসির মত বোকার মার গলা শোনা গেল, নতুন বৌদি, দরজা খোল।

সঙ্গে সঙ্গে অজয় বললো, রোজ সাত সকালে এ ভাঙা কাঁসির আওয়াজ শুনলেই আমার মেজাজ গরম হয়ে যায়। বেল বাজাতে যে ওর কি হয়।

অঞ্জলি হাসতে হাসতে বললো, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতেই ও চীৎকার করে। তাছাড়া ইলেকট্রিক-এ হাত দিতে ওর ভয় করে।

ভয় না। কচু।

বোকার মা ঠিকে ঝি। এ বাড়িতে আসার পর প্রথম বছর খানেক বিন্দু-বাসিনী কাজ করে হঠাৎ একবার উধাও। তারপর ঘোষ বাড়ির বড় জেঠিমা বোকার মাকে ঠিক করে দেন। তখনও অজয় হয়নি।

দুচার দিন পরেই অজয়ের মা বললেন, ছাখ যদি ঠিক মত কাজ করো তাহলে পুজোয় শাড়ি ছাড়াও টুকটাক কিছু না কিছু পাবে। আর যদি কাজ

ছাড়তেই হয় তাহলে বলে কয়ে যেয়ো। বিন্দুর মত উধাও হয়ে যেয়ো না।

নারকেল ছোবড়ায় ছাই আর সোডা মাখিয়ে কড়ার কালি ঘষতে ঘষতে বোকার মা বললো, বিন্দুর উধাও না হয়ে উপায় ছিল? মিত্তির বাড়ির ছোট কত্তার সঙ্গে যা করেছে।

অজয়ের মা চুপ করে শোনেন।

বোকার মা কড়া মাজতে মাজতেই আপন মনে বলে ওঠে, ছি ছি মুড়ো ঝাঁটা মারতে হয় অমন ছোট কত্তার কপালে।

অজয়ের মা বিরক্ত হয়েই বললেন, কি বাজে বকছ, কেউ শুনলে কি বলবেন বল তো?

বোকার মার হাত থামে না, মুখও থামে না। বলে, কেউ জানলে·মানে? ছোট কত্তার চরিত্তিরের খবর কে না জানে? পাড়াসুদ্ধ সবাই জানে।

কি বকবক করছ বোকার মা?

ঐ মিত্তির বাড়ির কথা বলছিলাম আর কি।

কোন্ মিত্তির বাড়ি?

আপনি মিত্তির বাড়ি চেনেন না? শেতলা বাড়ি চেনেন?

চিনি মানে দেখেছি।

ঐ শেতলা বাড়ির পাশেই একটা তেতলা লাল বাড়ি আছে না? ঐটাই তো মিত্তিরদের বাড়ি।

অত খেয়াল করিনি।

সে কী? অত বড় বাড়িটাও চোখে পড়ে নি? সব সময় বাড়ির সামনে মোটর দাঁড়িয়ে থাকে, চোখে না পড়ে উপায় আছে?

সে যাই হোক, কি হয়েছে কি?

হাঁড়ি-কড়া মাজা শেষ। বোকার মা পটাপট এক একটা থালা-গেলাস-বাটিতে নারকেল ছোবড়া ঘষছে আর বালতির জলে ডুবুতে ডুবুতেই বলে যায়, ছোট কত্তার চরিত্তিরের তো বালাই নেই। কিন্তু বিন্দুরও বলিহারী লোভ। যেমনি বাড়াবাড়ি করতে গিয়েছে—তেমনি······

হাতের কাজ শেষ হলেই অজয়ের মা শোবার ঘরে চলে যান।

কথা শোনার কেউ নেই। তবু হাঁড়ি-কড়া থালা-গেলাস ধুতে ধুতেই বোকার মা বকবক করে যায়—ওরে বাপু, আমরাও কি গঙ্গা জলে ধোয়া তুলসী পাতা? তাই বলে তুই ছোট বউয়ের হার গলায় দিয়ে ঘুরে বেড়াবি?

হতচ্ছাড়ি কোথাকার ? তুই কি ভেবেছিলি ছোট বউ আর আসবে না ? দু'দিন ছোট কত্তার সোহাগ খেয়েই কি ভাবলি মিত্তির বাড়ির ছোট বউ হয়ে গেছিস ?

মুখ বুঁজে কাজ করতে পারে না বোকার মা। ধোয়া বাসন রান্না ঘরে রাখতে রাখতে বলে যায়, মিত্তির বাড়ি আমিও তিন বছর কাজ করেছি। আর সে কী আজকের কথা, তখন আমাকে দেখলে শুধু ছোট কত্তা কেন, অনেকেরই মাথা ঘুরে যেত। ছোট কত্তা তো আমার দিকেও হাত বাড়িয়েছিলেন, কিন্তু তাই বলে কি আমি হুমড়ি খেয়ে·· ···

আঃ। আবার কি আজে বাজে কথা বলছ ?

বোকার মা আর কথা বলে না। চলে যায়।

বোকার মা ভোরবেলায় শুধু বাসন মেজে দিযেই চলে যায। সব বাড়ির কাজ শেষ করে আবার আসে, কি গো কি মসলা বাটব ?

অজয়ের মা মসলা দেবার আগেই ও শিল-নোড়া নেয়। তারপর হলুদ-লঙ্কা-জিরে-পাঁচ ফোড়ন পিষতে পিষতেই বলে, যে যাই বলুক, পুলিশের বাবুর বউ হবার মত সুখ আর নেই। মাসে মাসে মাইনে বাড়ে, গহনা আসে, শাড়ি আসে। আহাহা !

অনেক বকুনি দিয়েও ওর কথা বলা বন্ধ করতে পারেননি অজয়ের মা। বকুনি দিলে একটু থামবে। কিন্তু একটু পরেই আবার শুরু করবে। করবেই। প্রথম প্রথম অসহ্য লাগত অজয়ের মার। আস্তে আস্তে সহ্য হয়ে গেছে। এখন বরং বোকার মা কথা না বললেই উনি জিজ্ঞাসা করেন, কি গো বোকার মা, আজ হয়েছে কি ?

বারো মাস তিনশ' পঁয়ষট্টি দিন তো গতর দিচ্ছি। কালীপুজো দুগ্গা পুজোর দিনও আসছি, তার এত কাল পরে সাত দিনের জন্য জ্বরে পড়েছিলাম বলে দুটো টাকা মাইনে কেটে নিলে ?

কে মাইনে কাটল ?

বোকার মা'র কানে সে কথা পোঁছায় না। সে আপন মনে বলে যায়, বউয়ের সামনে তো খুব বীরপুরুষ, কিন্তু যখন বউ বাচ্চা হতে বাপের বাড়ি গিয়েছিল, তখন ? তখন তো কোকিলের মত সুর করে ডাকতে, বোকার মা, একটু গা টিপে দিবি ? শরীরটা ভাল না। তখন তো বাসন মেজে আসবারও তর সইত না।

অজয়ের মা রান্না করতে করতেই ওর কথা শোনেন। হাসেন। না হেসে পারেন না।

শিল-নোড়া থেকে সরষে বাটিতে তুলতে তুলতেই বোকার মা বলে, চৌকির পাশে দাঁড়িয়ে গা টিপতে গেলেই তো বলতে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি গা টেপা যায়? বিছানায় বসে বসেই দাও। এখন যদি বৌকে বলি তুমি বাপের বাড়ী গেলে তোমার বিছানায় বসেই বাবু আমাকে সোহাগ করতেন, তাহলে কি হবে?

মুখ টিপে টিপে হাসতে হাসতেই অজয়ের মা খুব জোরে একটা নিঃশ্বাস না ফেলে পারেন না।

ঠিকে ঝি বলে কি আমার ধর্ম নেই? কত বছর আগের কথা, কিন্তু সে সব কথা কোনদিন বলেছি? বলিনি। পরের সংসারে আগুন লাগিয়ে আমার কি হবে?

শিল-নোড়া ধুয়ে রাখতে রাখতে বোকার মা অজয়ের মাকে বলে, তিরিশ বছর ধরে বাবুদের বাড়িতে বাড়িতে বাসন মাজতে মাজতে কি কম কিছু দেখলাম?

তিরিশ বছর ধরে তুমি কাজ করছ?

তার বই কম নয়।

তোমার বয়স কত হলো?

এর সঙ্গে চোদ্দ বছর জুড়ে নাও।

চুয়াল্লিশ?

তাই হয় বুঝি?

হ্যাঁ, কিন্তু তোমাকে দেখে তো মনে হয় না তোমার এত বয়স হয়েছে।

বোকার মা আত্মগর্ব্বের হাসি হেসে বলে, গতরটাকে ঠিক না রাখলে চলবে কি করে?

বোকার মার ঐ একটাই দোষ। বড় বেশী কথা বলে। কিছুতেই মুখ বুঁজে কাজ করতে পারে না। বকুনি দিলে পাঁচ-দশ মিনিট চুপ করে থাকবে, কিন্তু আবার শুরু করবেই। আগে আগে অজয়ের মা রোজ বকুনি দিতেন। এখন আর কিছু বলেন না। গা সহ্য হয়ে গেছে। ঐ দোষটুকু ছাড়া বোকার মার আর কোন দোষ নেই। শীত গ্রীষ্ম বারো মাস ঠিক সময় আসবে যাবে। পাঁচ মিনিটের এদিক ওদিক হবে না। কামাই করে না। কদাচিৎ কখনও

এক বেলা না এলে আগেই বলবে, ছোট বোনের ছেলেমেয়েদের একটু দেখতে যাব ভাবছি। কিছুদিন ধরেই ওদের জন্য মনটা কেমন ছটফট করছে।···

একবার দেখে এসো না।

কাল বিকেলে যদি না আসি তাহলে······

ঠিক আছে, এসো না।

বাসন-কোসন রেখে দিও। আমি পরশু সকালে মেজে দেব। তাছাড়া বাসন-কোসন এমন ভাবে মাজবে যে নতুনের মত চক্‌চক্‌ ঝক্‌ঝক্‌ করে। আরো অনেক গুণ আছে বোকার মার। বড় সৎ। অজয়ের মা যেখানে সেখানে পয়সা কড়ি ছড়িয়ে রাখেন। বোকার মা রোজ পয়সা কড়ি তুলে এনে দেবার সময় বলবে, কত কষ্ট করে বাড়ির পুরুষ মানুষ রোজগার করবে আর তুমি সেই পয়সা কড়ি এভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলে রাখো কেন?

ঘর পরিষ্কার করতে করতে বলবে, দেশে কি রামরাজত্ব হয়েছে যে আলমারিটা এমন করে খুলে রেখেছ?

আলমারি বন্ধ করিনি!

তালা চাবি দেবার অভ্যাস তোমার আছে নাকি? রোজই তো দেখি কিছু না কিছু হা করে খুলে রেখেছ।

অজয়ের মা আলমারি বন্ধ করতে এলেই বোকার মা বলে, যখন একবার এসেছ তখন বিছানার উপর থেকে কানের দুল দুটোও তুলে রাখ। হারিয়ে গেলে তো এই বেকার মার নামেই দোষ পড়বে।

বোকার মা যত বকবকই করুক ওকে ছাড়া অজয়ের মার একটা দিনও চলে না। ও মসলা বাটতে শুরু করলেই উনি ছোট্ট কেটলিতে দু'কাপ জল বসিয়ে দেবেনই। তারপর বোকার মা শিল-নোড়া ধুয়ে রাখতে না রাখতেই উনি এক কাপ চা এগিয়ে দিয়ে বলেন, নাও চা খাও। টেবিলের উপর তোমার সিঙ্গাড়া আছে, নিয়ে নাও।

এ বাড়িতে সিঙ্গাড়াই আসুক আর রসগোল্লাই আসুক, বোকার মা একটু ভাগ পাবেই। টেবিলের উপর থেকে সিঙ্গাড়া এনে চায়ের কাপে চুমুক দিয়েই বোকার মা বলে, রোজ এই সময় চা আর খাবার খাইয়ে খাইয়ে তুমি আমার অভ্যাস খারাপ করে দিয়েছ।

অজয়ের মা চা খেতে খেতে হাসেন।

হাসছ কি গো, সত্যি বলছি, আগে এ সময় কোনদিন চা খেতাম না, কিন্তু

এখন এক কাপ না হলেই চলে না। সেদিন বোনের বাড়ি গিয়ে হঠাৎ মাথা ধরতেই খেয়াল হলো, তাইতো চা খাওয়া হয়নি। সঙ্গে সঙ্গে বোনঝিকে বললুম, এক কাপ চা দিবি মা, তা নয়ত এ মাথা ধরা ছাড়বে না।

অজয়ের মা তখনও হাসেন।

হাসির কথা নয়গো, সত্যিই বলছি চা পেটে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মাথা ধরা সেরে গেল।

তোমাকে কি আর কোন বাড়িতে চা দেয় না?

মিথ্যে বলব না বাপু কলেজে পড়ায় যে বাবু তার বউ রোজ ভোরবেলায় এক কাপ দেবেনই। কোন কোনদিন বিস্কুটও দেয়। তোমাদের মতনই ভদ্দরলোক ওরা। না চাইতেই ফি বছরে এক টাকা করে মাইনে বাড়িয়ে দেন।

তাই নাকি?

হ্যাঁ গো। চায়ের কাপ প্লেট নিয়ে কলতলার দিকে যেতে যেতে এক গাল হাসি হেসে বললো, ছ' টাকায় শুরু করে এখন পাই বারো টাকা।

যা দিনকাল পড়েছে তাতে দু'একটাকা না বাড়িয়ে দিলে তোমাদেরই বা চলবে কি করে।

রান্নাঘর থেকে বেরুতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল বোকার মা। বললো, ও কথাটি বলো না। বাবুরা সিনেমা দেখতে পারেন, বউকে রং বেরং এর শাড়ি দিতে পারেন, শালীর বিয়েতে গহনা দিতে পারেন, কিন্তু ঝিকে একটা টাকা দিতে গেলেই বাবুদের সংসারে হাহাকার পড়ে যায়।

যা বলেছ।

অজয়ের বাবা বাড়িতে থাকলে বোকার মার মুখ দিয়ে একটা শব্দ বেরুবে না। ওকে বড় ভয় ওর। অত্যন্ত রাশভারী প্রকৃতির লোক। বাড়িতে থাকলেই একটা বই নিয়ে বসে থাকেন। কারুর সঙ্গেই বিশেষ কথাবার্তা বলেন না। বোকার মা সায়া পরে না, ব্লাউজ পরে না। শুধু একটা শাড়ি পরেই কাজ করতে আসে। মাথায় ঘোমটার বালাই নেই, কিন্তু অজয়ের বাবা থাকলে কলা বউয়ের মত ঘোমটা না দিয়ে তাঁর ঘরে ঢুকবে না। অজয়ের দাদা অসিতকে বোকার মার খুব পছন্দ। কিন্তু অজয়কে দেখতে পারে না। অসিত বাবার মতই ধীর, স্থির, শান্ত। অসিত এক একটা পরীক্ষায় পাশ করেছে আর বোকার মা জয়কেষ্টর দোকান থেকে ঠোঙা ভর্তি খাবার এনে

দিয়েছে।

কই গো বড় খোকা কই ?

আমাকে ডাকছ ?

এই নাও, মিষ্টি খাও।

একি ? এত মিষ্টি দিচ্ছ কেন ?

তুমি পাশ করেছ আর আমি তোমাকে মিষ্টি খাওয়াবো না ?

অসিত মিষ্টির ঠোঙা হাতে নিয়ে বলে, কিন্তু……

ইতিমধ্যে অজয় এসে বলে, আমার মিষ্টি কোথায় ?

তোমাকে কচু দেব।

কেন ? দাদা কি তোমাকে স্বর্গে পৌছে দেবে ?

খোকার মা চুপ করে থাকে না। বলে, সগ্‌গে পৌছে না দিলেও রোজগার করে আমাকে খাওয়াবে—পরাবে।

তোমাকে বেনারসী শাড়ী কিনে দেবে না ?

আমি চাইলে তাও দেবে।

আমিও পরীক্ষায় পাশ করেছি, আমাকেও এক ঠোঙা মিষ্টি দিতে হবে।

তোমাকে এক ফুটো পয়সার লবনচুসও দেব না।

সত্যি অসিতকে খোকার মা ভালবাসে। নিজের ছেলের মতই ভালবাসে। অসিত যখন সত্যি সত্যি পাশ করে চাকরিতে ঢুকল, তখন ওর কি আনন্দ। তারপর প্রথম মাসের মাইনে পেয়ে অসিত এক জোড়া শাড়ি আর পনেরটা টাকা খোকার মাকে দিলে, সে সারা পাড়ায় জানিয়েছিল, তিনটে পাস করার সঙ্গে সঙ্গেই বড় খোকা সাহেবী কোম্পানীতে চাকরি পেয়েছে। প্রথম মাসের মাইনে পেয়েই আমাকে একজোড়া খুব সুন্দর শাড়ি আর পনেরটা টাকা দিয়েছে।

শুধু সেবার নয, প্রত্যেক মাসেই মাইনে পেয়ে অসিত ওকে পাঁচটা টাকা দেয়। খোকার মা এমন খুশী হয় যেন লাখ টাকা পেয়েছে। কখনও কখনও বলে, ফি মাসে দেবার কি দরকার বড় খোকা। যদি দরকার হয় আমি নিজে চেয়ে নেব।

অজয়ের মা বলেন, এত টাকা মাইনে পাচ্ছে আর কি পাঁচটা টাকা দিতে পারবে না ?

অজয় হঠাৎ হাজির হয়ে বলে, দাদার বিয়ে হলে বৌদি তোমাকে গলা ধাক্কা

দিয়ে তাড়াবে।

খোকার মা জানে এ বাড়িতে বনিয়াদ তার পাকা তাই সঙ্গে সঙ্গে বলে, বড় খোকার বউ এলে মাসে মাসে দশ টাকা পাব।

বেশ কটা বছর পার হয়ে গেল।

অসিতের বিয়ে হলো। অজয় ডাক্তার হলো। ওদের বাবা রিটায়ার করলেন। অজয়ের বাবা-মা কখনও দেশের বাড়িতে, কখনও কলকাতায় থাকেন। কখনো চলে যান কাশী-গয়া-মথুরা-বৃন্দাবন।

অসিতের মত অঞ্জলিও খোকার মাকে খুব পছন্দ করে। নতুন বৌদি বলতে খোকার মাও অজ্ঞান। নতুন বৌদিকে প্রাণের কথা না বললে ওর শান্তি নেই। শাশুড়ীর মতই সেও চুপ করে শোনে।

জান নতুন বৌদি, বেঁটে উকিলের ছেলেটা নেশা করতে শুরু করেছে। আজ সকালে গিয়ে দেখি বউটা কাঁদছে।

অঞ্জলি বেঁটে উকিলকে না চিনলেও বলে, তাই নাকি?

হ্যাঁগো নতুন বৌদি। আমি তো ভোরবেলায় বাড়িতে ঢুকে থতমত খেয়ে গেছি। বাড়িতে ঢুকেই কি দেখলাম জান?

কি?

উকিলের বউ ছেলের বমি ধুচ্ছেন।

বমি?

হ্যাঁগো বমি! বেশী নেশা করলে বমি করবে না? এর আগেও উকিলের বউকে বমি ধুতে দেখেছি কিন্তু ঠিক ধরতে পারিনি। আজ বউটার কান্নাকাটি শুনে ·····

ছেলে নেশা করে আর বাবা-মা কিছু বলেন না?

বাবা নেশা করে না কিন্তু জোচ্চুরি করে। ও আবার ছেলেকে কি শাসন করবে? হাতের কাজ করতে করতে খোকার মা একটু থামে। অঞ্জলির দিকে তাকিয়ে বলে, বাপ বেটা বদমাইস হলে কি হয়, উকিলের বউ সাক্ষাৎ মা দুগ্‌গা।

আচ্ছা!

সত্যি বলছি নতুন বৌদি। ঐ একটা লোকের জন্য এখনও ভগবান ওদের ভাত-কাপড় জুগিয়ে যাচ্ছেন। হঠাৎ একটু হেসে খোকার মা বললো, সব

বদ লোকগুলোর বউ ভাল হয় কেন বল তো ?

সত্যি নাকি ?

হ্যাগো নতুন বৌদি। ফণী দারোগা যেমন ঘুসখোর তেমন বদমাইস। মাসের মধ্যে পনের দিনই তো বাইরে রাত কাটায়। কিন্তু ওর বউ ?

খুব ভাল বুঝি ?

ভাল মানে ? তুলনা হয় না। এক ঘণ্টা ধরে পূজো না করে মুখে জল পর্য্যন্ত দেয় না। অমন মা পেয়েছিল বলেই মেয়ে দুটোও খুব ভালো হয়েছে।

হঠাৎ খুব জোরে কলিং বেল বাজতেই অঞ্জলি বললো, কে এলো দেখ তো।

শিল নোড়া রেখে উঠতে উঠতে বোকার মা বললো, আওয়াজ শুনেও বুঝতে পারছ না, ডাক্তারবাবু এসেছেন ?

অঞ্জলি হাসে।

সত্যি অজয় এসেছে।

বোকার মা রান্নাঘরে ফিরে গিয়েই বললো, এদের কি আমি নতুন যে চিনতে পারব না। বড় খোকার মত ছোট খোকাও ছেলে ভাল, কিন্তু কথা-বার্ত্তার ছিরি নেই।

হঠাৎ রান্না ঘরের দরজার সামনে এসে অজয় বললো, বৌদি ও আমার কি নিন্দা করছিল ?

অঞ্জলি হাসতে হাসতে বললো, ওকেই জিজ্ঞাসা কর না!

হ্যাঁ হ্যাঁ আমিই জবাব দিচ্ছি। আমি কি তোমাকে ভয় খাই যে···

ভনিতা না করে কি বলছিলে তাই বল।

বোকার মা হাসতে হাসতে বললো, তুমি ছেলেটা ভাল কিন্তু কথাবার্ত্তার কোন ছিরি নেই।

তোমার কথাবার্ত্তার ছিরি আছে ?

দাঁত বের করে হাসতে হাসতে বোকার মা বললো, আমারও নেই তোমারও নেই।

অজয় অঞ্জলির দিকে তাকিয়ে বললো, কোন্ বাড়ির ঝি এভাবে কথা বলবে বল তো ?

হঠাৎ বোকার মার মুখের চেহারা বদলে গেল। গম্ভীর হয়ে বললো, ছি, ছি, ছোট খোকা। যার কোলে চড়ে মানুষ হয়েছ, যার বুকের দুধ না খেলে

ঘুম আসত না, তাকে ঝি বলতে তোমার বাধে না? কর্তাবাবু এত খর্চা করে লেখাপড়া শেখালেন কি…

বোকার মা পুরো কথাটা শেষ করতে পারল না। চোখের জল মুছতে মুছতে কলতলায় চলে গেল।

অজয় থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

একটু পরে অঞ্জলি বললো, ঠাকুরপো হাজার হোক তোমার জন্মের আগে থেকে ও আমাদের বাড়িতে কাজ করছে। তোমাদের দু' ভাইকে ছেলের মতই ভালবাসে। ওকে ঝি বলা তোমার ঠিক হয়নি।

লজ্জায়, দুঃখে অজয় চুপ করে নিজের ঘরে চলে গেল। একটু পরে চোখে মুখে জল দিয়ে বোকার মা কলতলা থেকে রান্না ঘরে এসেই বললো, নতুন বৌদি, হাজার পুরানো হলেও আমি এ বাড়ির ঝি। বাবুদের বাড়িতে বাসন মেজে মেজেই আমার পেট চলে। ছোটখোকা এখন তো আর ছোট নেই। সে এখন ডাক্তার। এই সব কথা বলা আমার খুব অন্যায় হয়েছে।

অঞ্জলিও বোকার মাকে প্রায় দু' বছর ধরে দেখছে, কিন্তু ওকে এমন বিবর্ণ বিষণ্ণ কোনদিন দেখে নি। গলার স্বরটাও কেমন করুণ হয়ে গেছে। অঞ্জলি বললো, যাকে তুমি কোলে করে মানুষ করেছ তাকে নিশ্চয়ই তুমি শাসন করবে। তুমি কিছু অন্যায় করনি।

ছোট খোকা কোথায়?

বোধহয় ওর ঘরেই আছে।

বোকার মা সোজা অজয়ের ঘরে চলে যায়। দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়েই খুব চাপা গলায় বললো, ছোট খোকা, আমি মাঝে মাঝে ভুলে যাই যে আমি এ বাড়ির ঝি। তুমিও আমার একজন মনিব।

হঠাৎ বোকার মার পিছন থেকে অঞ্জলি অজয়ের কাছে গিয়ে আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছিয়ে দিতে দিতে বললো, কাঁদে না ঠাকুরপো। ওঠ।

বোকার মা বললো, নতুন বৌদি, তুমি চায়ের জল বসাও। হঠাৎ ক্লান্ত হয়ে এসে একটা কথা বলে ফেলেছে। আমিও মুখ্যু মানুষ, দুম করে যা তা বলে দিয়েছি। তাই বলে কি সত্যি সত্যিই—বোকার মা বেরিয়ে গেল।

দু' পাঁচ মিনিট চুপ করে থাকার পর অজয় বললো, সত্যি বৌদি আমার ভীষণ অন্যায় হয়ে গেছে।

ও খুব দুঃখ পেয়েছে।

দুঃখ পাবারই কথা। আমাদের ফ্যামিলির জন্ম ও কি কম করেছে? দাদা যখন খুব ছোট তখন মা মেজমামার ওখানে বেড়াতে গিয়ে পর পর দু' বার টাইফয়েড হয়ে প্রায় পঙ্গু হয়ে গিয়েছিলেন। সেই সময় বোকার মাই বাবার দেখাশুনা করেছে।

অঞ্জলি চুপ করে শোনে।

অজয় বললো, আমি যখন হলাম, তখনও মার শরীর খুব খারাপ। বোকার মা না থাকলে হয়ত আমি বাঁচতামই না।

জানি।

ও আমাদের দু' ভাইকে এতো ভালবাসে বলেই তো বাবা মা ওকে কিছু বলেন না।

ও আমাকেও খুব ভালবাসে। বিয়ের সময় কিছু দিতে পারেনি বলে গত ম্যারেজ এ্যানিভার্সিরির দিন ও আমাকে একটা আংটি দিয়েছে।

সে কি?

হ্যাঁ ঠাকুরপো। বলতে বারণ করেছিল বলে কাউকে বলিনি। শুধু তোমার দাদা জানেন।

কি আশ্চর্য!

হঠাৎ দরজার ওপাশ থেকে বোকার মার গলা শুনেই ওরা দুজনে চমকে উঠল, নতুন বৌদি, চায়ের জল হয়েছে? এক ঠোঙা খাবার হাতে করে অজয়ের ঘরের সামনে এসে বললো, এখনও গল্প করছ? চট করে তিন কাপ চা কর।

অঞ্জলি এগুতেই অজয় ঝড়ের বেগে এগিয়ে এসে বোকার মাকে কোলে তুলে নিয়েই বললো, আর কোনদিন যদি এমন করে চোখের জল ফেলো তাহলে তোমার মাথা ফাটিয়ে দেব।

হাসতে হাসতে বোকার মা বললো, শুনছ নতুন বৌদি? হতভাগা ছেলের কথার ছিরি দেখছ?

অজয় ভাল চাকরি পেয়ে পাটনা চলে যাবার আগে ওর বাবা-মা দেশের বাড়ি থেকে কলকাতায় এলেন। মা বললেন, কোয়ার্টার যখন পাচ্ছিস তখন আমিই বরং তোর সঙ্গে পাটনা চলে যাই।

অজয় বললো, কাকামণি মারা যাবার পর বাবাকে যখন দেশেই থাকতে হবে, তখন তুমিই বরং বাবার কাছে থাকো।

অসিত বললো, তুই বরং কিছুদিনের জন্য তোর বৌদিকে নিয়ে যা।

অজয় মুখ টিপে হাসতে হাসতে অঞ্জলিকে জিজ্ঞাসা করল, কি গো সুন্দরী আমার সঙ্গে যাবে নাকি?

বেশ কষ্ট করে হাসি চেপে অঞ্জলি বললো, যে ছেলে মা আর দাদার সামনেই এই রকম অসভ্যতা করে তার সঙ্গে আবার পাটনা?

অজয় সঙ্গে সঙ্গে সুর করে গান গায়। প্রাণ চায়, চক্ষু না চায়, মরি একি তোর দুস্তর লজ্জা?

ওর গান শুনে ওর মা, দাদা, বৌদি হেসে উঠলেন। হাসি থামলে অজয় বললো, কাউকেই আমার সঙ্গে যেতে হবে না, আমি একলাই যাচ্ছি। বিদ্যুৎ যখন বউকে নিয়ে গেছে তখন আমি ওর ওখানেই খেতে পারব।

ওর মা বললেন, তা তো পারবি কিন্তু…

অজয় ওর মার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললো, তাছাড়া, ছ'মাস এক বছরের মধ্যেই যখন আমার বিয়ে হচ্ছে তখন এত চিন্তার কি আছে?

অজয়ের পৌঁছান সংবাদ পাবার পর ওর বাবা-মা আবার বালুরঘাটে ফিরে গেলেন। অজয় কলকাতায়, বালুরঘাটে নিয়মিত চিঠি লেখে। ভালই আছে। পাশেই বিদ্যুতের কোয়ার্টার। দুই বন্ধুতে বেশ জমিয়েছে। খাওয়া দাওয়ার একটুও কষ্ট হচ্ছে না। অঞ্জলিকে মজা করে লিখেছে, তোমার চাইতে বিদ্যুতের বউ আমাকে অনেক বেশী যত্ন করছে। সুতরাং নিকট-ভবিষ্যতে তোমার কাছে যাচ্ছি না।

অজয়ের চিঠি পাবার পরই অঞ্জলি জবাব দেবে ভেবেছিল, কিন্তু বাড়িতে খাম না থাকায় কদিন দেরি হয়ে গেল। সেদিন রাত্রে চিঠি লিখে শুতে যাবার আগে অঞ্জলি অসিতকে বললো, টেবিলের উপর চিঠিটা থাকল। কাল অফিসে যাওয়ার সময় পোস্ট করে দিও।

কি লিখলে?

লিখলাম তুমি দু'তিন দিনের ছুটি পেলেই আমরা পাটনা আসছি।

সত্যি যাবে?

তুমি তো আচ্ছা লোক! এত করে বলার পরও জিজ্ঞাসা করছ, সত্যি যাব কিনা?

অসিত হাসে।

তুমি কি ছুটির কথা বলনি ?

বলেছি মানে ··

মানে আবার কি ? তুমি যদি ছুটি না নাও আমি একলাই চলে যাব।

আচ্ছা, এখন তো শুতে এসো। শোবার আগে রাগারাগি করে না।

তাই নাকি ?

আচ্ছা, আচ্ছা, কালকে গিয়ে আবার ছুটির কথা বলব।

সত্যি বলছ ?

সত্যি।

ভোরবেলায় খুব জোরে কলিং বেল বাজতেই অঞ্জলি চমকে উঠলো, কি গো, টেলিগ্রাম এলো নাকি ?

বোধহয়।

বালুরঘাট থেকে এলো নাকি কে জানে।

অসিত বিছানা ছেড়ে যেতেই অঞ্জলিও উঠল। দরজা খুলেই অসিত চীৎকার করল, অজু এসেছে।

কোন মতে শাড়ির আঁচলটা গায়ে জড়াতে জড়াতে অঞ্জলি জিজ্ঞাসা করল, সত্যি ?

অজয় দাদাকে প্রণাম করতেই অসিত বললো, তুই ভিতরে যা, আমি স্যুটকেস নিয়ে আসছি।

অঞ্জলিও বেরিয়ে এলো। আমি জানতাম তুমি আসবেই।

বাজে বকো না।

সত্যি বলছি ঠাকুরপো। কাল রাত্রে তোমাকে চিঠি লিখতে লিখতেই মনে হচ্ছিল তিন মাস হয়ে গেল। তুমি নিশ্চয়ই একবার আসবে।

একটু পরেই বোকার মা এলো। সেও অজয়কে দেখে অবাক। খুশী। ভীষণ খুশী।

অফিস বেরুবার আগে অসিত জিজ্ঞাসা করল, কদিন থাকবি ?

অজয় কিছু বলার আগেই অঞ্জলি বললো, আসতে না আসতেই যাবার কথা জিজ্ঞাসা করছ কেন ?

ক'দিন ছুটি নিয়ে এসেছে তাই জিজ্ঞাসা করছি।

ছুটি যে কদিনই থাক, চট করে যাচ্ছে না।

অজয় জিজ্ঞাসা করল, তার মানে ?

অঞ্জলি বললো, তার মানে দরকার হলে ছুটি বাড়িয়ে নেবে।

অজয় হাসতে হাসতে বললো, তুমি কি ভেবেছ তোমার কোন বয়ফ্রেণ্ডের আণ্ডারে কাজ করি ?

অঞ্জলি অসিতকে বললো, তুমি অফিস যাও, তাড়াতাড়ি এসো। আমি পারমিশন না দেওয়া পর্য্যন্ত ঠাকুরপো যাবে না।

অজয় শুধু একটু হাসল।

অসিত বেরিয়ে গেল।

পর পর ছ'তিনবার চা খেতে খেতে অজয় আর অঞ্জু গল্প করছিল। পাটনার হাসপাতালের গল্প, বিদ্যুতের বউয়ের গল্প, সার্জিক্যাল নার্স জয়শ্রী ঘোষের গল্প, শিউলির মোটা মোটা চিঠির কথা। আরো কত কি।

নতুন বৌদি দরজা খোল।

অঞ্জলি দরজা খুলে দিতেই বোকার মা জিজ্ঞাসা করল, রান্নাবান্না শুরু করেছ নাকি ছোটখোকার সঙ্গে গল্পই করছ।

অঞ্জলিও হাসতে হাসতে জবাব দেয়, আজ তো শুধু মাংস ভাত হবে! কতক্ষণই বা লাগবে।

বোকার মাকে মসলা দিয়ে অঞ্জলি বলল, তোমার মসলা বাটা হলেই তিন কাপ চায়ের জল বসিয়ে দিও।

আচ্ছা।

অঞ্জলি অজয়ের ঘরে এসে আবার গল্প শুরু করল।

পাঁচ-সাত মিনিট পরে হঠাৎ বোকার মা চিৎকার করে উঠল। ওরা ছুজনে রান্নাঘরে ছুটে গিয়ে দেখল মশলা বাটতে বাটতে বোকার মা পাশে পড়ে গেছে। যন্ত্রণায় ছটফট করছে। ঘামছে। অজয় তাড়াতাড়ি ওর পাল্‌স দেখল, বুকে হাত দিল।

বৌদি, নীচের তলার কাউকে একটা ট্যাক্সি আনতে বলো। খুব তাড়াতাড়ি। আই থিংক হার্ট এ্যাটাক।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ বি কুইক !

অঞ্জলি ছুটে বেরিয়ে যেতেই খোকার মা অজয়ের একটা হাত চেপে ধরে অস্ফুট স্বরে বললো, আমি আর বাঁচব না ছোটখোকা। আমি জানতাম তোকে আমি কাছে পাবই।

অজয় স্তম্ভিত।

অঞ্জলি ট্যাক্সির কথা বলে উপরে আসতেই অজয় চিৎকার করে উঠল, বৌদি, খোকার মা নেই।

# ধ্বস

দার্জিলিং থেকে রওনা হবার সময় আকাশের এক কোণায় সামান্য এক টুকরো মেঘ ছিল ঠিকই, কিন্তু কেউ গ্রাহ্য করেননি। এমন মেঘ তো প্রায় বারো মাসই দার্জিলিঙের আকাশে কোথাও না কোথাও ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। ট্যাক্সিতে মালপত্তর তুলে উজ্জ্বল রিসেপশন কাউণ্টারের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লাক্সারীর বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলছিল। কোটটা আর হ্যাণ্ড ব্যাগ হাতে নিয়ে একটু পরেই সোমা এসে পাশে দাঁড়াল। তরুণবাবু একবার সোমার দিকে তাকিয়েই উজ্জ্বলকে বললো, আপনাদের মত লোকজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব না করাই ভাল।

চোখ দুটো বড় বড় করে সোমা জিজ্ঞাসা করল, কেন ?

একবার একটু জোরে নিঃশ্বাস ফেলে তরুণবাবু বললেন, নানা কারণে।

নানা কারণে ? বিস্মিত হয়ে উজ্জ্বল প্রশ্ন করল।

কত প্যাসেঞ্জারই তো আমাদের হোটেলে আসা-যাওয়া করেন, কিন্তু আপনাদের মত প্যাসেঞ্জার চলে গেলেই মনটা খারাপ হয়ে যায়।

মিনিট খানেকের জন্য সবাই চুপ। সবাই কি যেন ভাবছেন, মনে মনে কি যেন হিসাব-নিকাশ করছেন।

সোমা জিজ্ঞাসা করল, আর কি কারণ ?

তরুণবাবু একটু হেসে বললেন, কথা দিলেও আর কোনদিন আসবেন কিনা তার তো কোন ঠিক-ঠিকানা নেই।

সোমা এক মুহূর্তের জন্য উজ্জ্বলকে দেখেই হাসতে হাসতে বললো, অন বিহাফ্ অফ্ মাই হাসব্যাণ্ড আমি কথা দিচ্ছি এই সামনের পুজোতেই আবার আসব।

উজ্জ্বলও কথা দিল, হ্যাঁ হ্যাঁ সত্যি আসব।

এই হোটেলেই উঠবেন তো ?

সোমা বলল, ও না উঠলেও আমি উঠব।

একসঙ্গে তিনজনেই হেসে উঠলেন।

হ্যাণ্ডসেক। নমস্কার। গুড বাই।

ট্যাক্সি। যাত্রা শুরু। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল দশ দিন স্বর্গরাজ্যের স্মৃতি রোমন্থন।

সোমার একটা হাত নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে উজ্জল জিজ্ঞাসা করল, বল, কেমন কাটালে এ কটা দিন ?

একথা আবার জিজ্ঞাসা করছ ?

জিজ্ঞাসা করব না ?

না।

কেন ?

এসব স্মৃতি প্রশ্নোত্তরের উর্ধ্বে।

তবু জানতে তো ইচ্ছে করে।

এসব প্রশ্নের উত্তর নিজের মনের মধ্যেই পাওয়া যায়।

তুমি কিছু বলবে না ?

এখন না।

কেন ?

এক্ষুণি নেশা করে এলাম তো। এখন বেশ বেহুঁস আছি। পরে বলব।

উজ্জল খুশি। বললো, আর পরে বলতে হবে না। আমার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছি।

দুজনেই একটু চুপচাপ।

হঠাৎ মুহূর্তের জন্য দৃষ্টিটা বাইরের দিকে যেতেই উজ্জল চমকে উঠল, দেখেছ কি মেঘ করেছে।

সোমা মিটমিট করে হাসতে হাসতে বললো, আমার আকাশে এখন শরতের হাসি। কোথাও এক টুকরো মেঘ নেই।

বাইরের আকাশের ঘন কালো মেঘ দেখে সে শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল, সেই উজ্জল খুশীতে ভরে উঠল। সোমাকে একটু কাছে টেনে নিয়ে কানে কানে বললো, এটা ট্যাক্সি না হয়ে রেলের কূপে হলে……

থাক থাক। আর বলতে হবে না।

কেন ?

রেলের কূপে হলে তুমিও জানিয়ে দিতে যে তোমার মনেও কোন মেঘ নেই, বরং…

সোমা থামতেই উজ্জল বললো, বরং বলেই থামলে কেন ? কথাটা শেষ কর।

কথাটা শেষ করে আর কী হবে ? তার চাইতে কয়েক ঘণ্টা পরে শিলি-গুড়িতে ট্রেনের কূপে উঠেই বরং তুমি···

বেহুঁস অবস্থাতেও আবার নেশা করবে ?

এমন বেহুঁস আছি যে তুমি নেশা করিযে দিলেও তো আপত্তি করতে পারব না।

লাভলি।

খেলনার মত গাড়ী গড গড় করে নেমে আসছে। দার্জিলিং শহরটা পিছনে ফেলার পরেই টিপ টিপ করে বৃষ্টি শুরু হয়েছিল। যত নীচে নামছে বৃষ্টিও ততই বাড়ছে। দরজার কাঁচ তুলে দিতে হয়েছে। উইণ্ডস্ক্রীনে ওয়াইপার চলছে। ঘুম ছাড়বার পর থেকেই ট্যাক্সির গতি কমছে। উজ্জ্বল একটু চিন্তিত না হয়ে পারে না। বললো, সোমা বৃষ্টি যে বাড়ছে।

বাড়বেই তো !

তার মানে ?

যে মেয়ে দার্জিলিঙে জন্মেছে তাকে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছ আর হিমালয় কাঁদবে না ?

তুমি দার্জিলিঙে জন্মেছিলে ?

পৃথিবীতে এমন সুন্দর জায়গা আর কোথায় আছে যে আমি জন্মাতে পারি ?

তুমি দার্জিলিঙে জন্মেছ বলেই কী তোমার দিদিমা তোমাকে পার্বতী বলে ডাকেন ?

হ্যাঁ।

আমি কোথায় জন্মেছি জান ?

কোথায় ?

পুরীতে।

সোমা হাসতে হাসতে বললো, আমিও এই রকমই একটা কিছু অনুমান করেছিলাম।

কেন ?

হিমালয় দুহিতা পার্বতীর কাছে তুমি যে ভাবে মাথা নত করে থাক তাই দেখে···

যদি বলি অতলস্পর্শ সমুদ্র-নন্দনকে দেখে হিমালয় দুহিতা মুগ্ধ হয়ে আত্ম-

সমর্পণ করে ?

সেটা বোধহয় হিমালয় দুহিতার ঔদার্য।

কার্শিয়াং।

এত জোরে বৃষ্টি হচ্ছে যে এক কাপ চা খাবার জন্য ট্যাক্সি থেকে বেরুবার উপায় নেই। তবু ড্রাইভার নেমে গেল।

উজ্জ্বল বললো, এ তো আচ্ছা বৃষ্টি শুরু হলো।

সত্যি। তাছাড়া এই স্পীডে ট্যাক্সি চললে তো ট্রেন ধরাই মুস্কিল হবে।

ও কথা বলো না সোমা। বুধবার আমাকে বাঙ্গালোরে পৌছতেই হবে।

সে তো আমিও জানি, কিন্তু হিল্‌স-এ বৃষ্টি বড খারাপ জিনিষ। কখন যে কী হবে, কেউ বলতে পারে না।

রাস্তা খুব খারাপ হয়ে যায়, তাই না ?

রাস্তা ভাল খারাপে এখানকার ড্রাইভারদের বিশেষ কিছু আসে যায় না। কিন্তু বেশীক্ষণ বৃষ্টি হলেই যেকোন সময় যেকোন জায়গায় ধ্বস নামতে পারে।

এই একদিনের বৃষ্টিতেই ?

ধ্বস নামার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। কখনও দু'এক ঘণ্টার বৃষ্টিতেও ধ্বস নামে আবার কখনও কখনও দু'পাঁচ দিনের বৃষ্টিতেও কিছু হয় না।

হঠাৎ এক লাফে দরজা খুলেই ড্রাইভার ট্যাক্সির ভিতরে ঢুকল। বলল, সাব, সড়ক বন্ধ।

সে কী।

হ্যাঁ সাব। আমি অনেকক্ষণ ধরেই উল্টো দিকের কোন গাড়ী দেখছিলাম না বলে সন্দেহ হচ্ছিল। যা ভেবেছিলাম তাই হয়েছে।

সোমা আর উজ্জ্বল একসঙ্গে প্রশ্ন করল, ধ্বস নেমেছে ?

জী সাব।

তাহলে ?

সড়ক সাফ করা শুরু হয়ে গেছে, কিন্তু সকালের আগে কোন গাড়ী যেতে দেবে না।

তাই নাকি ?

হাঁ সাব।

দু'পাঁচ মিনিট সবাই চুপ। কারুর মুখেই কোন কথা নেই।

ড্রাইভার বললো, সাব, ইনস্‌পেকশন বাংলোয় জায়গা আছে। আপনারা ঐখানে চলে যান। তারপর কাল খুব ভোরবেলায়···

উজ্জ্বল শুধু বললো, কিন্তু আমাকে তো বুধবার জয়েন করতেই হবে।

সোমা জিজ্ঞাসা করল, একটা কাজ করলে হয় না?

কী?

আমরা যদি কাল বাগডোগরা থেকে কলকাতা প্লেনে চলে যাই?

একটু যেন আশার আলো দেখল উজ্জ্বল। বললো, কিন্তু···

কলকাতা থেকে ব্যাঙ্গালোরে প্লেনে যাওয়া অনেক কম খরচের। তাছাড়া কলকাতা থেকে তো আমাদের রিজার্ভেশন করাই আছে।

তা ঠিক, কিন্তু ·

আবার কি কিন্তু?

যদি কাল প্লেনে সীট না থাকে?

ঠিক পাওয়া যাবে। তাছাড়া এখন তো সীজন নয় যে ভীড় থাকবে।

এতক্ষণে ড্রাইভার আবার কথা বললো, চলুন সাব আপনাদের পৌঁছে দিয়ে আসি। দেরী করলে ওখানেও জায়গা পাওয়া যাবে না।

সোমা জিজ্ঞাসা করল, মালপত্র?

বৃষ্টি থামলে আমি পৌঁছে দেব।

উজ্জ্বল বললো, ঠিক হ্যায় চলো।

আর দেরী না করে ওরা তিনজনেই বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে পড়ল।

সত্যি ইনস্‌পেকশন বাংলোয় একটা ঘর পাওয়া গেল। কিন্তু বৃষ্টিতে ভিজে উজ্জ্বল এক মুহূর্ত না দেরী করে সঙ্গে সঙ্গে কম্বলের তলায় চলে গেল। বললো, সোমা আমি কিন্তু কিছুতেই বিছানা ছেড়ে উঠছি না। আমাকে খাইয়ে দাইয়ে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব তোমার।

আমি তো তোমাকে উঠতে বলছি না।

বাঁচালে। এখন যদি স্বামীর দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আমাকে বাজারে ছুটতে হয় তাহলে আমি আর নেই।

আজে-বাজে কথা বলো নাতো। চুপ করে শুয়ে থাক। ঠিক সময়ে তুমি তোমার খাবার দাবার পেয়ে যাবে।

শুধু আমাকে খাইয়ো না, তুমিও কিছু খেও।

ভয় নেই, আমার উপবাস করার অভ্যাস নেই।

ড্রাইভার আর চৌকিদারের জন্য খাওয়া-দাওয়ার বিধিব্যবস্থা করতে সোমার বিশেষ অসুবিধা হলো না। দু'হাতে দু'কাপ চা নিয়ে কিচেন থেকে বারান্দা পার হয়ে ঘরে যাবার পথে সোমা চমকে উঠল। এ কী, এ গান কে বাজাচ্ছে। এ তো আমারই গাওয়া। কিন্তু···

না, না, এতে কোন কিন্তু নেই। থাকতে পারে না। নিজের গলা নিজে চিনতে পারব না? হঠাৎ রবীন্দ্র রচনাবলীর মাঝখানের একটা পাতা খুলে পার্থ বলেছিল, সোমা পর পর ছ'টা গান গেয়ে যাও আমি রেকর্ড করব।

তুমি যখনই বল তখনই তো আমি তোমাকে গান শোনাই। রেকর্ড করার কী দরকার?

টেপ রেকর্ডারে ক্যাসেট ভরতে ভরতে পার্থ বললো, দ্যাখ সোমা শরতের মেঘের মত এসব দিন কখন কোথায় ভেসে চলে যাবে কেউ বলতে পারে না। তাই আগে থেকে ভবিষ্যতের জন্য কিছু সঞ্চয় করে রাখা ভাল।

এসব আজেবাজে কথা বললে আমি আর কোনদিন তোমাকে গান শোনাব না।

আচ্ছা বলব না, কিন্তু সব সময় তোমার গান শুনতে পাই না, তাই···

সোমা আর কোন কথা না বলে রেকর্ডিং-এর বোতামটা টিপে দিয়েই গাইতে শুরু করল, আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ সুরের বাঁধনে, তুমি জান না আমি তোমাকে পেয়েছি অজানা সাধনে।

শেষ হতেই আবার শুরু করল, এই উদাসী হাওযার পথে পথে। তারপর, মম দুঃখের সাধন সবে করিনু নিবেদন তব চরণতলে। তারপর, বাণী মোর নাহি স্তব্ধ হৃদয়ে বিদায় চাহিতে শুধু জানি।

দু'কাপ চা হাতে নিয়ে গানগুলো শুনতে শুনতে বিভোর হয়ে যায় সোমা। ভাবল, পার্থ এখানে একলা বসে বসে আজও আমার গান শুনছে?

বিবিজী, গান শুনছেন?

হঠাৎ চৌকিদারের গলা শুনে সোমা লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। কোন মতে নিজেকে সামলে নিয়ে বললো, হঁ্যা।

এই প্রফেসারবাবু প্রায়ই আমাদের এখানে আসেন।

তাই নাকি?

হঁ্যা বিবিজী। আর সারাদিন মেশিনে ওর বিবির গান শোনেন।

বিবির গান ?

হ্যাঁ হ্যাঁ।  ওঁর বিবি যে মারা গিয়েছেন।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ বিবিজী খুব দুঃখের কথা।

প্রফেসার সাহেবের নাম বলতে পার ?

পার্থ চক্রবর্ত্তী।  সরকারী কলেজে

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে সোমা বললো, হ্যাঁ হ্যাঁ কাগজে পড়েছিলাম ওঁর স্ত্রী মারা গিয়েছেন।

# শিউলি

কলকাতা থেকে দিল্লী বদলী হয়ে এসে প্রথম দিন অফিস ফেরত বাসের লাইন দেখেই অজয় অবাক। ভেবেই পেল না। কোন্ লাইন কোন্ বাসের জন্ত। খালি বাস আসছে, থামছে, যাত্রী বোঝাই করছে, চলে যাচ্ছে, কিন্তু কোন বাসের গায় মাথায় গন্তব্যস্থল লেখা নেই। ব্যাপার দেখে অজয় তো তাজ্জব। ভাবে সব প্যাসেঞ্জারই কি কণ্ডাক্টরদের চেনেন? ওদের দেখেই কি ওরা বাসে চড়েন? এটা গ্রাম, নাকি কোন শহর, আজকাল তো গ্রামের বাসেও বড বড করে লেখা থাকে 'বর্ধমান হইতে কাটোযা' বা 'কণ্টাই হইতে দীঘা'।

ত্ব চারদিন নাস্তানাবুদ হয়েই অফিস যাতায়াত করতে হল অজয়কে। তারপর আর পারল না। অফিসের এক বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করল, কিভাবে অফিসে যাতায়াত করি বলুন তো? এখানকার বাসের কোন মাথামুণ্ডু বুঝতে পারি না।

মিশ্র হাসতে হাসতে বললেন, আমিও দিল্লীতে আসার পর ঠিক একই প্রবলেম ফেস করতাম। কোন্ বাস কোথায় যায় তা জানলেও বাসে যাতারাত করা খুবই মুশকিল।

কেন?

এখানকার বাস সার্ভিস একেবারে হোপলেস।

আপনারা যাতাযাত করেন কিসে?

চার্টার্ড বাসে।

চার্টার্ড বাসে? অজয় অবাক হয়ে জানতে চাইল, সেটা কী ব্যাপার?

মানে আর কী স্পেশাল বাস। একটু ভাড়া বেশী লাগে ঠিকই কিন্তু বেশ আরামে ঠিক টাইমে অফিস আসা-যাওয়া করা যায়।

তাই নাকি?

আমাদের অফিসে অনেকেই তো চার্টার্ড বাসে আসা-যাওয়া করেন।

আমাকেও এরকম একটা কিছু ব্যবস্থা করে দিন না। বেঁচে যাই।

এ আর এমন কি ব্যাপার? আপনি কৈলাস কলোনীতে আছেন, তাই না?

হ্যাঁ !

আমাদের অ্যাকাউন্ট্যান্ট মিঃ ঘোষকে বলে আজই ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। উনিও কৈলাস কলোনী থেকে চার্টার্ড বাসে যাতায়াত করেন।

সত্যি ব্যবস্থা হয়ে গেল। গ্রেটার কৈলাস থেকে বাস সওয়া নটায় ছেড়ে নটা পঁচিশে কৈলাস কলোনীর মোড়ে আসে। পার্লামেন্ট স্ট্রীট অফিসের উল্টোদিকে অল ইণ্ডিয়া রেডিওর সামনে পৌঁছয় দশটা বাজার দশ বারো মিনিট আগে। ছুটির পর পাঁচটা কুড়ি পঁচিশে রওনা হয়ে ছটার মধ্যে বাড়ি। মাসিক ভাড়া পঁয়ত্রিশ টাকা, কিন্তু তা হোক, বেশ আরাম করে যাতায়াত করা যায়। অজয় খুব খুশি।

এ বাসে বাঙালী-বিহারী-মাদ্রাজী-পাঞ্জাবী—সব রকমেরই যাত্রী যাতায়াত করেন। নানা বয়সের কিছু মেয়ে যাত্রীও আছেন। তবে দেখে মনে হয় সবাই মোটামুটি ভালই চাকরী করেন। হাজার হোক সরকারী বাসের চাইতে ভাড়া অনেক বেশী। প্রথম দু একদিন লজ্জা করত, কিন্তু তারপর মুখ চেনা হতে দেরী লাগল না। বাস স্টপে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ঐ বাসের অন্য যাত্রীদের দিকে তাকিয়ে একটু হাসি ; হয়ত বা সামান্য দু-একটা কথাবার্তা। আস্তে আস্তে আরও দু'এক ধাপ এগিয়ে একটু আলাপ, আপনি কি অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে আছেন ?

হ্যাঁ। আপনি ?

আমি ইঞ্জিনীয়ার্স ইণ্ডিয়াতে আছি।

আপনি ইঞ্জিনীয়ার ?

হ্যাঁ !

আপনার নামটা তো জানা হল না। আমি কুলদীপ সিং।

আমার নাম অজয় ঘোষাল।

বাসে বসে পাশের যাত্রীদের সঙ্গেও টুকটাক কথাবার্তা হয়। মিঃ দেশাই বললেন, আর কিছু না হোক চার্টার্ড বাসের কল্যাণে গিন্নীরা খুব খুশি। তাই না মিঃ ঘোষাল ?

একটু চাপা হাসি হেসে অজয় বলল, আমি খুব খুশি।

আমি জিজ্ঞাসা করছি আপনার স্ত্রী খুশি কিনা ?

বলতে পারব না।

মাই গড ! আপনার স্ত্রী খুশি কিনা আপনি তাও জানেন না ?

না।

কিন্তু আপনার মত বয়সে তো স্ত্রীর সঙ্গে কোন মতবিরোধ হবার কথা নয়।

মতবিরোধ তো হয়নি।

তাহলে জানেন না বলছেন কেন?

বউ না পেলে তো তার মনের খবর রাখতে পারি না।

ওর কথায় আশে-পাশের যাত্রীরাও হেসে ওঠেন। মিঃ চাওলা বললেন, তাড়াতাড়ি বিয়ে করুন মিঃ ঘোষাল। অনেক কাল নেমতন্ন খাই না।

বিয়ের আগে কন্যাপক্ষকে আপনার ইচ্ছার কথা জানিয়ে দেব।

আবার হাসি।

বেশ লাগে অজয়ের। চার্টার্ড বাসের দৌলতে অফিস যাতায়াত এখন কষ্টের নয়, বরং আনন্দের। কিন্তু হঠাৎ একদিন মন খারাপ হয়ে গেল। পর পর কদিন মেয়েটাকে দেখতে না পেয়ে কেমন যেন একটা বিস্বাদ অনুভব করল মনে মনে। আলাপ না থাকলেও পরিচয় ছিল। কখনও কখনও পাশাপাশি বসে যাতায়াত করেছে। স্পীডের মাথায় বাস মোড় ঘুরলেই হাতে হাতে ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে গেছে। একটু রোমাঞ্চিত বোধ করেছে অজয়। নিছক কয়েকটি মুহূর্তের জন্য দোলা খেয়েছে মনে মনে। তারপর অফিসের কাজ বা মাসীর হাতের হালুয়া খেতে খেতে সে স্বপ্নের কথা ভুলে গেলেও বাসে উঠেই শূন্যতার একটু জ্বালা অনুভব করে অজয়।

বোধহয় সপ্তাহ খানেক হবে। তারপর হঠাৎ একদিন অফিস যাওয়ার সময় বাসেই দেখা। চোখাচোখি হতেই মেয়েটি হাসল, কিন্তু মুহূর্তের জন্য যেন অজয়ের হৃদপিণ্ড স্তব্ধ হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই সামলে নিল, একটু হাসল। দু'একদিন পরে অফিস থেকে ফেরার সময় ওর পাশে বসেই অজয় বলল, বিয়ে করলেন অথচ মিষ্টান্ন-মিতব্যয়ের জনার সময় আমার কথা মনে পড়ল না?

ব্যস্ত কী, পাবেন।

আবার আট দশ দিন যেতে না যেতেই উধাও। এবার অজয় মনে মনে হাসল। ভাবল বসন্তরাজের কাছে যাবার আগে একবার তো বলতে পারতে, চললাম, দিল্লী এলে দেখা হবে। আবার মনে মনেই নিজেকে সান্ত্বনা দেয়, স্বয়ং পার্বতী যদি শিবের জন্য কাণ্ডজ্ঞান হারাতে পারেন তাহলে এর আর কী দোষ।

দিন পনের পরেই আবার উদয়, কিন্তু অত সাধারণ বেশভূষা দেখে অজয় একটু অবাক না হয়ে পারল না। সিঁথিতে সিঁদুর নেই। ভাবতে গিয়েও ভয় করে। আবার ভাবল আজকালকার দিনে অনেক বিবাহিতা মেয়েই তো সিঁথিতে সিঁদুর দেয় না। ওর পাশের খালি সীটে বসেই অজয় জিজ্ঞাসা করল, কেমন আছেন?

খুব ভাল।

খুব স্বাভাবিক, কিন্তু মাঝে মাঝেই উধাও হয়ে যাবার···অজয়কে কথা শেষ করতে না দিয়েই উনি বললেন, ভয় নেই, আর উধাও হব না। এবার পুরো দেনা মিটিয়েই এসেছি।

কথাটা কেমন বেসুরো মনে হলো অজয়ের। জিজ্ঞাসা করল, তার মানে? আর কোনদিন কোথাও আমাকে যেতে হবে না। যেমন ছিলাম তেমনি বাবা মার কাছে থাকব।

কেন?

যাবার প্রযোজন ফুরিয়ে গেছে বলে।

তাই কি কখন হয়? নতুন নতুন একটু ভুল বোঝাবুঝি হযেছে বলেই··

মোটে তো দুদিন ওকে দেখিছি।

কেন?

মাত্র চারদিনের ছুটিতে এসে বিয়ে করেই চলে গেলেন। কথা ছিল দিন পনের পরে এসে আমাকে নিযে যাবেন, কিন্তু তার আগেই আমাকে ছুটতে হল।

ওর কথাবার্তা শুনে অজয় যেন বোকা হয়ে গেছে। ওর কোন কথাই বুঝতে পারছে না। জিজ্ঞাসা করল, কেন?

এয়ার ফোর্স হেড কোয়ার্টার্স থেকে খবর দিল, সব শেষ।

কী বলছেন আপনি?

তাই তো বললাম, সব দেনা মিটিয়ে এসেছি। আর আমি উধাও হব না।

বেশ কয়েক মাস পরের কথা।

অজয় একটা বই ওকে দিয়ে বলল, এর মধ্যে আপনার একটা জিনিষ আছে। বাড়িতে গিয়ে দেখবেন।

আমার জিনিষ ?

হ্যাঁ, আপনার।

কিন্তু এর মধ্যে··

এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন ? বাড়িতে গেলেই তো দেখতে পাবেন।

বাড়িতে গিয়ে খামের ভিতরের দু'লাইনের চিঠিটা পড়ে শিউলি স্তম্ভিত। বার বার পড়ল। মুখস্থ হয়ে গেল। সারারাত ধরে মনে মনে আবৃত্তি করল, ভোরের শিশিরের মত শিউলি ঝরে পড়বেই, চাঁপা চামেলী রজনীগন্ধা গন্ধরাজের মত সে বৃন্তে থাকে না। ঝরা শিউলিই কুড়িয়ে নিয়ে মন্দির করতে হয় আমাদের ঘর, মন। আমিও ঝরা শিউলি তুলে নেব, তুমি আপত্তি করবে না, করতে পারবে না।

# চাঁপা

পাড়ার কিছু বন্ধুবান্ধব ও একদল ছেলেছোকরা বার বার অনুরোধ করার পরও কমলবাবু বললেন, এককালে অনেক কিছু করলেও এসব বহুকাল ছেড়ে দিয়েছি। আমাকে বরং তোমরা বাদ দাও।

বাদ দাও বললেই কি ওরা ছেড়ে দেন? ওরা বললেন, না কমলদা, এবার আর আপনাকে ছাড়ছি না।

কিন্তু আমাকে দিয়ে কী কাজ হবে? কোনরকম দৌড়াদৌড়ি হৈ হুল্লোড় করার বয়সও আর আমার নেই।

দুর্গাপুজো কমিটির ভাইস প্রেসিডেণ্ট যতীনবাবু বললেন, তোমাকে দৌড়া-দৌড়ি—হৈ হুল্লোড় কিছুই করতে হবে না। তুমি ভাই এদের সঙ্গে সঙ্গে ঘোরাঘুরি করে কিছু চাঁদা তুলে দেবে।

চাঁদা? কমলবাবু চমকে উঠলেন।

আসল কথা, এবার বিজ্ঞাপনের অবস্থা বিশেষ ভাল না! কিছু বেশি চাঁদা না তুললে এবার পুজো করাই সমস্যা হবে।···

কিন্তু আমি কেমন করে···

তুমি সঙ্গে থাকলে আশে-পাশের বড়লোকের পাড়াগুলো থেকে হয়তো ভালই চাঁদা উঠবে। আমাদের এসব পাড়ায় কেউই পাঁচ টাকার বেশি চাঁদা না দিলেও শান্তি নিকেতন—ওয়েস্ট এণ্ডের কেউ দশ টাকার কম দেবেন না। তাই···

তুমি যখন বলছ তখন নিশ্চয়ই যাব, কিন্তু আমার রূপ দেখেই যদি কেউ দরজা বন্ধ করে দেন, তাহলে···

কমলবাবুর কথায় ছেলে ছোকরারা হেসে ওঠে। হাসি থামলে পুজো কমিটির সেক্রেটারী বিমল সেন বললেন, আপনি দেখবেন এই দু'তিনটে পাড়া থেকেই কম সে কম দেড় দু'হাজার টাকা চাঁদা উঠবে।

চা এল।

চা খেতে খেতে যতীনবাবু বললেন, বিশ্বাস কর কমল, এই দিল্লীতেই আগে

তিন শ' সাড়ে তিন শ' টাকায় আমরা দুর্গাপুজা করেছি। আর গতবার আমাদের কত খরচ হয়েছে জান ?

কত ?

বাইশ হাজার।

বিমল সেন বললেন, এবার কিছু না হলেও ছাব্বিশ-সাতাশ হাজার খরচ হবে।

কমলবাবু হাসতে হাসতে বললেন, আমি যখন কলকাতায় এম, এ পড়তে গেলাম তখন বাবা আমাকে মাসে মাসে তিরিশ টাকা পাঠাতেন বলে হিন্দু হস্টেলের ছেলেরা আমাকে প্রিন্স বলে ডাকত।

যতীনবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, সে সব দিনের কথা এখন আরব্য উপন্যাসের মত মনে হয়। পাঁচ টাকা কিলো পটল খেতে হবে, এ আমরা জন্মেও ভাবতে পারি নি।

আরো কিছুক্ষণ গল্প-গুজব করে ওরা চলে গেলেন। যাবার আগে বিমলবাবু বলে গেলেন, রবিবার আটটা নাগাদ সুকুমারদা এসে আপনাকে পিক-আপ করে নেবেন। আবার বারোটা একটার মধ্যেই ফিরিয়ে দিয়ে যাবেন।

ঠিক আছে।

ওরা চলে যাবার পরই গিন্নী বাইরের ঘরে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, ওরা কী জন্য এসেছিলেন ?

দুর্গাপুজোর চাঁদা তুলে দিতে হবে।

তোমাকে ?

আমার সঙ্গে ওরাও দু'একজন থাকবে।

তাহলে তোমার যাবার কী দরকার।

ওদের ধারণা আমি সঙ্গে থাকলে আশেপাশের বড়লোকের পাড়ায় ভাল চাঁদা উঠবে।

ঈষৎ বাঁকা হাসি হেসে গিন্নী বললেন, তুমি চাঁদা তুলবে, তাহলেই হয়েছে।

সুন্দরী, প্রজাপতি ঋষিকে ফুল-জল-বেলপাতা চড়িয়ে তোমাকে ঘরে আনার আগে এ অধম এ রকম ঘরকুনো ছিল না।

তাই নাকি ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। এবার যখন এলাহাবাদ যাবে তখন আমার দু'একজন পুরনো বন্ধুবান্ধবকে জিজ্ঞাসা করলেই…

আমার আর জিজ্ঞাসা করে কাজ নেই। গিন্নী আর দাঁড়ালেন না।

পরের রবিবার আটটা বাজতে না বাজতেই সুকুমারবাবু গাড়ি নিয়ে এলেন। সঙ্গে আরো দু'জন, কিশোর ঘোষ ও নন্দ রায়। গাড়িতে যেতে যেতেই ঠিক করা হল বিদেশীদের কাছে যাওয়া হবে না, কিন্তু বাঙালী-অবাঙালী সবার কাছেই ওরা যাবেন।

গেট খুলে ভিতরে ঢুকে বেল বাজাতেই একটি মেয়ে পাতলা ফিনফিনে নাইলনের নাইটি পরে দরজা খুলতেই কমলবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, মিঃ জয়সওয়াল আছেন?

আছেন। হোয়াট স্যুড আই টেল হিম?

আমরা দুর্গাপুজো কমিটির পক্ষ থেকে এসেছি।

যাস্ট এ মিনিট।

মেয়েটি চলে যাওয়ার এক মিনিটের মধ্যেই একজন বয়স্কা মহিলা এসে বললেন, মিঃ জয়সওয়াল ঘুমুচ্ছেন। আপনাদের কী দরকার জানতে পারি?

আমরা দুর্গাপুজোর জন্য কিছু চাঁদা নিতে এসেছি।

কত দিতে হবে?

আপনাদের যা ইচ্ছা।

আই মীন আশেপাশের বাড়ির অন্যেরা…

সুকুমারবাবু বললেন, আপনাদের কাছেই প্রথম এসেছি।

এক্সকিউজ মী। আমি এক্ষুণি আসছি।

একটু পরে উনি এক টাকার কয়েকটা নোট এগিয়ে দিয়ে বললেন, একুশ টাকা দিচ্ছি। মনে কিছু করবেন না।

কৃতজ্ঞতার হাসি হেসে কমলবাবু বললেন, আপনি এক টাকা দিলেও কিছু মনে করব না।

না, না, তাই কী হয়?

সুকুমারবাবু রসিদ বই বার করে জিজ্ঞাসা করলেন, যদি কাইণ্ডলি আপনার নামটা বলেন।

ভদ্রমহিলা হেসে বললেন, হাসব্যাণ্ডের টাকা যখন দিলাম তখন তার নাম লেখাই উচিত। মিঃ এস. এল. জয়সওয়াল।

সুকুমাবাবু রসিদ লিখলেন। কমলবাবু ইনভিটেশন কার্ডে মিঃ এ্যাণ্ড মিসেস এস. এল. জয়সওয়াল লিখে দুজনেই প্রায় একসঙ্গে বললেন, নিশ্চয়ই

আসবেন।

আসব।

জয়সওয়াল সাহেবের বাড়ী থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পা দিতেই সুকুমারবাবু বললেন, দেখলেন কমলদা, এই হচ্ছে শান্তিনিকেতন। আমি তো ভাবতেই পারিনি দু'মিনিটের মধ্যেই একুশ টাকা পেয়ে যাব। এ পাড়ার সবাই লাখপতি। একুশ টাকা হাতের ময়লাও না।

নন্দ রায় খুব উৎসাহের সঙ্গে বলল, এভাবে সবাই দিলে তো একটা পাড়া থেকেই তিন-চার হাজার টাকা উঠে যাবে। জয়সওয়াল সাহেবের বাড়ির সামনে গাড়ি রেখে ওরা আশেপাশের আরো কটি বাড়ী গেলেন।

চাকর দরজা খুলতেই সুকুমারবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, সাব হ্যায় ?

সাব জাপান গ্যায়া।

মেমসাব ?

আজ ভোরের প্লেনেই বোম্বে গিয়েছেন।

পাশের বাড়িতেও বেল বাজাতেই চাকর দরজা খুলল।

সাহেব আছেন ?

সাব কলকাতা গিয়েছেন।

মেমসাহেব আছেন ?

আছেন।

বল দুর্গাপুজো কমিটির লোকজন এসেছেন।

দু'চার মিনিট পরে চাকরটি ভিতর থেকে ঘুরে এসে একটা দশ টাকার নোট এগিয়ে দিয়ে বলল, মেমসাব চা খাচ্ছেন। এই দশটা টাকা দিয়ে দিলেন।

একটু বিরক্ত হলেও সুকুমারবাবু সাহেবের নাম জেনে রসিদ লিখলেন।

কমলবাবু নেমতন্নর চিঠিতেও নাম লিখে চাকরের হাতে গছিয়ে দিয়ে বাইরে এলেন।

সামনের দরজায় বেল বাজাতেই কুকুর ঘেউ ঘেউ করে উঠল। শাসন কর্তার কণ্ঠস্বরও শোনা গেল, ডোণ্ট বি সিলি পলি। পলির আর্তনাদ থামল।

মিঃ মুখার্জী দরজা খুললেন, ইয়েস।

আমরা এখানকার দুর্গাপুজো কমিটির পক্ষ থেকে

কাম ইন।

ওকে অনুসরণ করে এরাও ড্রইংরুমে গেলেন ।

প্লীজ টেক ইওর সীটস।

সবাই বসলেন।

নাউ টেল মী হোয়াট ইউ ওয়াণ্ট ।

কমলবাবু ইংরেজীতেই বললেন, লোক্যাল দুর্গাপূজার জন্য কিছু চাঁদা নিতে এসেছি ।

দুর্গাপূজা শুনেই ড্রইংরুমের কোণ থেকে সতেরো-আঠারো বছরের মেয়েটি মিঃ মুখার্জীর সামনে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, ডাডি, মন্টি্লে সেই আট হাতওয়ালা যে গডেসের পুজো হয়েছিল, সেই তো দুর্গা ?

মিঃ মুখার্জী হাসতে হাসতে বললেন, ইউ আর নিয়ারলি করেক্ট ! আট হাত নয়, দশ হাত থাকে দুর্গার।

মিঃ মুখার্জী ভদ্রতা, সৌজন্যতার ত্রুটি করলেন না। চা খাওয়ালেন । প্রায় আধঘণ্টা গল্প করার পর একটা পাঁচ টাকার নোট দিয়ে বললেন, আই হোপ দিস ইজ অলরাইট ?

অফ কোর্স।

গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকতেই সামনের দরজা খুলে মিঃ খৈতান বেরিয়ে এলেন।

নমস্কার।

নমস্কার।

উই আর ফ্রম লোক্যাল দুর্গাপূজা কমিটি ··

আরে মশাই, আমি কলকাতার ছেলে।

তাই নাকি ?

ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য এখানে থাকি বলে সাহেব হইনি ।

শুনে ওরা সবাই খুশী।

বলুন কী করতে পারি ?

আজ বরং থাক···

থাকবে কেন ? বলেই ফেলুন।

কিছু চাঁদা চাইতে এসেছিলাম।

সঙ্গে সঙ্গে মিঃ খৈতান পকেট থেকে পার্স বের করতে করতে বললেন, সামান্য চাঁদার জন্য ক'বার আসবেন। একটা একশ টাকার নোট আর একটা

এক টাকার নোট এগিয়ে ধরে বললেন, আমি এখানে থাকব কিনা ঠিক নেই। তবে অষ্টমীর দিন আমার মা নিশ্চয়ই যাবেন পুজো দিতে।

সুকুমার বাবু বললেন, শুধু অষ্টমীর দিন কেন?

মার শরীরটা ভাল না। শরীর ভাল থাকলে তো রোজই যেতেন।

কমলবাবু নেমতন্নর চিঠি দিয়ে বললেন, সামনের মোড়ের মাথায় গেলেই আমাদের পুজো প্যাণ্ডেল দেখতে পাবেন।

রসিদ আর নেমন্তন্নর চিঠি হাতে নিতে নিতে মিঃ খৈতান বললেন, মাইকে অঞ্জলির মন্ত্র শুনেই পৌঁছে যাবেন।

সাড়ে এগারটা বেজেছিল। তবু সুকুমারবাবু বললেন, আরো দুটো একটা বাড়ি ঘোরা যাক। কমলবাবু আপত্তি করলেন না।

বাড়ির দরজায় বাঙালীর নাম দেখে ঐ বাড়িতেই ওরা ঢুকলেন। বেল বাজাতেই ধুতি গেঞ্জি পরা একজন বাঙালী চাকর দরজা খুলল।

কমলবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, মিঃ ঘোষ আছেন?

একটু দাঁড়ান, ভিতরে খবর দিচ্ছি।

বোধহয় মিনিট খানেক। একজন ভদ্রমহিলা দরজার কাছে এসেই কমল-বাবুর দিকে চেয়ে থমকে দাঁড়ালেন, আপনারা?

পিছন থেকে সুকুমারবাবু উত্তর দিলেন, দুর্গা পুজোর চাঁদা নিতে এসেছি।

বিস্মিত দৃষ্টিতে কমলবাবুর দিকে তাকিয়ে উনি বললেন, আপনাকে···

কমলবাবু অতীত স্মৃতির ঝুলিতে খোঁজাখুঁজি করতে করতে বললেন, আমারও কেমন চেনা চেনা মনে হচ্ছে।

আপনি কি এলাহাবাদে ·

তুমি কী সান্ত্বনা?

আরে কমলদা।

কী আশ্চর্য্য! তুমি এত কাছে থাক?

রাস্তার ওপারেই।

হঠাৎ মুহূর্তের জন্য বিষন্নতায় দুজনেরই মুখ ম্লান হয়ে গেল। মনের মধ্যে একটা দমকা বাতাস উঠে মাঝখানের অন্ধকার দিনগুলো উড়িয়ে নিয়ে গেল। শরতের নীল আকাশের মাঝে যেমন সাদা সাদা মেঘের টুকরোগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে, ওদের দুজনের মনের মধ্যেও তেমনি অসংখ্য সুখ-স্মৃতির কথা চারিদিক থেকে উঁকি দিতে শুরু করল।

এসো কমলদা ভিতরে এসো। আপনারাও আসুন।

কোন কথা না বলে ওরা চারজনে ড্রইংরুমে এলেন। বসলেন। চা এল। চা খেতে খেতে মিসেস ঘোষ সুকুমারবাবুর দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, আমরা বহুকাল এলাহাবাদে কমলদাদের বাড়ির পাশেই থেকেছি।

তাই নাকি?

আমার ছোড়দা আর কমলদা একসঙ্গে বি, এ আর এম, এ পড়েছেন। তাছাড়া আমার ঠাকুমা ওকে খুব ভালবাসতেন।

কমলবাবু মনে মনে বললেন, তোমার ঠাকুমা কেন আমায় ভালবাসতেন, তা বলবে না? বলবে না তিনি আমাকে নাতজামাই বলে ডাকতেন? বলতে পারত তোমার ঠাকুমা বেঁচে থাকলে আমি আর তুমি এভাবে দুদিকে ছিটকে পড়তাম না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কমলবাবু বললেন, আজ ওসব কথা থাক। আরেক দিন হবে। আজ চাঁদা নিতে এসেছি। চাঁদা দাও।

কত দেব বল।

যা ইচ্ছে।

না, তুমি বল।

চাঁদা চাইতে এসে কী দাবী করতে পারি?

তুমি কী কোনকালেই কিছু দাবী করতে পারবে না?

আর কোন কথা না বলে মিসেস ঘোষ বাড়ির ভিতর থেকে একটা একশ টাকার নোট এনে সুকুমারবাবুকে দিয়ে বললেন, ঠিক আছে তো?

নিশ্চয়ই। কার নাম লিখব? রসিদের খাতা বের করতে করতে সুকুমারবাবু জিজ্ঞাসা করলেন।

লিখুন কমল ব্যানার্জী।

সান্ত্বনা!

তুমি চুপ কর কমলদা।

# রিজার্ভেশন ক্লার্ক

দশ তারিখে তো চারটে বার্থ হাবে না দাদা।

ক'টা আছে ?

দুটো।

একটা কূপে যদি কাইগুলি দেন তাহলে ওর মধ্যেই দুটো বাচ্চাকে ম্যানেজ করে নিতে পারি।

কাউণ্টারের ওপাশ থেকে ভদ্রলোকের অনুরোধ শুনতে শুনতেই অজয়বাবু রিজার্ভেশন চার্টের পর দিয়ে নজর বুলিয়ে নিতে নিতে বললেন অনেক রিকোয়েষ্ট, তবে হয়ে যেতে পারে।

কিন্তু না হলে তো বিপদে পড়ব।

আমি তো এখন ফাইন্যাল কথা দিতে পারি না। দশ তারিখ সকালে চার্ট তৈরী হবার সময় কী অবস্থা থাকবে তা কে বলতে পারে ?

এগারোই চারটে বার্থ পেতে পারি ?

ন' তারিখে পেতে পারেন।

দশ তারিখ থেকেই ছুটি শুরু।

তাহলে দশই দুটো বার্থ কনফার্ম করে দিচ্ছি, আর বাকী দুটো ওয়েটিং লিস্টে থাক। কোচ এ্যাটাচ করলে চারটে বার্থ ই পেয়ে যাবেন। তাছাড়া কূপের রিকোয়েস্ট লিখে রাখছি।

তাহলে তাই দিন।

কাউণ্টারের ওপাশ থেকে ইঙ্গিত পাবার সঙ্গে সঙ্গেই মেশিনের মত অজয় বাবুর হাত চলে। হিসেব করে বললেন, ন'শ বার টাকা তিরিশ পয়সা দিন।

সঙ্গে সঙ্গে একশ টাকার দশ খানা নোট এগিয়ে এল।

তিরিশ পয়সা খুচরো দিতে পারেন ?

তা হয়ে যাবে।

তিরিশ পয়সা বের করতে না করতেই অজয়বাবু তিন তিন বার একশ' টাকার নোটগুলো গুনলেন, দেখলেন ! টিকিট পাঞ্চ করে দু' তিন জায়গায় তার নম্বর টুকে নেবার পর তিরিশ পয়সা উঠিয়েই চারটে টিকিট আর ওয়েটিং

লিস্টের পোজিশন স্লিপ কাউন্টারের ওপাশে ঠেলে দিলেন।

ভদ্রলোক টিকিট নেবার পরই অজয়বাবু একটার পর একটা করে আটখানা দশ টাকার নোট দেবার পর বললেন, আর এই আট টাকা।

সঙ্গে সঙ্গে পিছনের ভদ্রলোক কাউন্টারের সামনে এসে রিজার্ভেশন স্লিপ এগিয়ে দিলেন।

ডুপ্লিকেট কালকা মেলে দিতে পারি।

গতবার ডুপ্লিকেট কালকা মেলে গিয়ে যে দুর্ভোগ

অজয়বাবুর অত কথা শোনার সময় নেই। বললেন, তাহলে পনেরই যান।

তের তারিখ থেকে সিমলার হোটেল বুক করা হয়ে গেছে যে। তাছাড়া···

তাহলে ডুপ্লিকেট ওয়ান আপ ছাড় তো কোন উপায় দেখছি না।

গতবার সারা রাস্তা না খেয়ে দেয়ে সাত ঘণ্টা লেটে··

অজয়বাবু আর বক বক করতে পারেন না। বললেন, তাহলে অন্য ট্রেনে চেষ্টা করুন।

ঠিক আছে, ডুপ্লিকেট কালকা মেলেই দিন। এত আগে এসেও যদি রিজার্ভেশন না পাই তাহলে তো···

এসব কথা শুনেও শোনেন না উনি। বললেন, সাতশ সাতচল্লিশ টাকা পনের পয়সা দিন।

অক্টোবরের শেষে পূজো, কিন্তু ফেয়ারলি প্লেস রিজার্ভেশন অফিসে এখনই পুরোদমে পূজোর ভীড় শুরু হয়ে গেছে। অফিস খোলার সঙ্গে সঙ্গেই পিঁপড়ের মত লাইন হয়ে যায় সব কাউন্টারের সামনে। এক মিনিটের জন্য কাউন্টার খালি থাকে না। এক কাপ চা তো দূরের কথা, তেষ্টায় গলা ফেটে গেলেও এক মিনিটের জন্য কাউন্টার ছেড়ে যাবার উপায় নেই কারুর। অজয়বাবু পিছন ফিরে একটু জোরে বলেন, বৃন্দাবন একটু জল খাওয়াবি ?

একদিন জীবনে অনেক স্বপ্ন দেখলেও জীবন নদীর মোহনায় এসে অজয়বাবুর তরী ডুবে গেল। তারপর ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে শেষ পর্যন্ত যখন ফেয়ারলি প্লেস রিজার্ভেশন অফিসের কাউন্টারের উঁচু চেয়ারে বসলেন তখন মন্দ লাগল না। সারাদিনে কত লোক আসে তাঁর কাছে। অবিরাম স্রোতের ধারার মত প্রতি মুহূর্তে একজন নতুন ধরনের লোক। কত কুখ্যাত বিখ্যাত লোকও আসছেন। রিজার্ভেশন স্লিপের উপর দিয়ে চোখ বুলিয়েই অজয়বাবু হাসতে হাসতে কাউন্টারের ওপাশের ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলেন, আউটডোর শুটিং

আছে বুঝি ?

আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে ভদ্রলোক শুধু মাথা নেড়ে বললেন, হ্যাঁ।

একটু পরে একটু অবসর পেয়েই অজয়বাবু কাউণ্টার থেকে উঠে পিছন দিকের টেবিলের একপাশে দাঁড়িয়ে একটু চাপা গলায় মিসেস ঘোষকে বললেন, একুশে থ্রী আপে উত্তম—সুচিত্রা—মাধবী—উৎপল দত্ত আউটডোর সুটিং করতে এলাহাবাদে যাচ্ছে।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ।

সুপ্রিয়াও যাচ্ছে নিশ্চয়ই ?

হ্যাঁ।

আর কে যাচ্ছে ?

তা জানি না। একুশে থ্রী আপে এই পাঁচজনই যাচ্ছে।

ফিল্মস্টারদের রিজার্ভেশন হলেই সবাই সব চাইতে আগে মিসেস ঘোষকে খবর দেন। ওদের ব্যাপারে ওর এত আগ্রহ যে কেউ ওকে খবর না দিয়ে থাকতে পারে না। সুবীর রায় ঠাট্টা করে বলে সবিতাদি, শুধু ফিল্মস্টারদের দেখে বা তাদের খবর জেনে কী হবে ? তুমি রেলের চাকরী ছেড়ে ফিল্মে নেমে পড়।

সামনের দুটো টেলিফোনই বেজে চলেছে, কিন্তু মিসেস ঘোষ সেদিকে নজর না দিয়ে চোখ দুটে বড় বড় করে মিষ্টি হাসি হাসতে হাসতে বললেন, এতকাল পরে তোমার ঘোষদাকে দিয়ে সিঁথিতে সিঁন্দুর পরিয়েছি তাও বুঝি তোমার সহ্য হচ্ছে না ?

খেলোয়াড়দের যাতায়াতের খবর সবার আগে বারিকবাবুকে দিতে হবেই। সাহিত্যিকের রিজার্ভেশন হলে প্রতিমা মিত্রকে খবর দিতে হয়। বয়স বেশী নয়। উপন্যাসের নায়িকার মত সুন্দর দুটো চোখে এখনও চঞ্চলতা। মদীর। সুবীর রায় মাঝে মাঝে মজা করার জন্য ভ্রু কুঁচকে গম্ভীর হয়ে বলে, কদিন আগে একটা উপন্যাস পড়লাম। খুব ভাল লাগল।

খুব আগ্রহের সঙ্গে প্রতিমা মিত্র জিজ্ঞাসা করলেন, কী নাম বলুন তো ?

ঠিক মনে পড়ছে না। তবে বোধহয় আপনাকে নিয়েই লেখা।

নায়ক কি সুবীর রায় ?

মাথা খারাপ ?

মন্ত্রী এম.পি বা লক্ষপতিদের নিয়ে কেউ মাথা ঘামান না। কোটিপতিরা রেলে চড়েন না। উড়োজাহাজেই ঘুরে বেড়ান। ওদের নিয়ে মাথা ঘামাবার অবকাশ নেই ফেয়ারলি প্লেস রিজার্ভেশন অফিসের লোকজনের।

কাউণ্টারের ওপাশের বিচিত্র লোকজন দেখে অজয়বাবুর দিন কেটে যায়। কেউ সুখে, কেউ দুঃখে, কেউ প্রয়োজনে, কেউ অপ্রয়োজনে রিজার্ভেশন করতে আসেন। কেউ একা, কেউ সপরিবারে, কেউ বা বিয়ের আগেই হনিমুনে যাবার জন্য কূপে চান। আরো কত ধরণের কত মানুষ আসেন। চোর-জোচ্চর, লম্পট-বদমাইস, খুনী, স্মাগলারও আসে অজয়বাবুর কাছে। কখনও কখনও আত্মীয় বন্ধুরাও এসে হাজির হন।

আরে অজয়, তুই ?

মাই গড ! তুই ! বিকাশকে দেখে অজয়বাবু খুশীতে ফেটে পড়েন।

তুই এখানে কতদিন ?

বছর দুই হল।

কিন্তু আমি তো এর আগে তোকে এখানে দেখিনি।

হয়তো ছুটিতে ছিলাম অথবা···

গোরার সঙ্গে দেখা হয় ?

অজয়বাবু হেসে বললেন, দেখা হয তবে ও এখন স্টেট ব্যাঙ্কের বড় অফিসার তো।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ। অজয়বাবু মুহূর্তের জন্য একটু চুপ করেও বললেন, তুইও তো এখন বিরাট লোক।

বাজে কথা ছাড়। একবার লক্ষ্মৌ আয়। প্রাণভরে আড্ডা দেওয়া যাবে।

আচ্ছা দেখি।

দেখি মানে ? তোকে রেলের ভাড়া দিতে হবে না। তারপর ওখানে পৌঁছলে তো আমিই আছি। বিকাশবাবু সঙ্গে সঙ্গে পার্স থেকে একটা ভিজিটিং কার্ড বের করে এগিয়ে দিয়ে বললেন, মনে হয় আরো বছর খানেক লক্ষ্মৌ আছি। একেবারে বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে চলে আয়।

বউ ছেলেমেয়ে কোথায় পাব ?

বিয়ে করিস নি ?

এখনও করি নি।

সে কী রে? বিয়ে না করে আছিস কেমন করে?

ফাঁকা কাউন্টারে ওপাশে হঠাৎ পরপর কয়েকজন ভদ্রলোক লাইন করে দাঁড়াতেই দুই বন্ধুর কথা বলায় বাধা পড়ল। অজয় নাইন আপ'এ বিকাশের রিজার্ভেশন করে দিতেই উনি চলে গেলেন। যাবার সময় আরেকবার বললেন, একটা চিঠি দিয়েই চলে আসিস।

আসব।

দিন এগিয়ে চলে। কাউন্টারের ভিতরে বসে বসেই অজয়বাবু রং বেরং-এর মানুষ দেখেন। নানা কথা ভাবেন। কে বলে দেশের লোকের কাছে টাকা নেই? ফেয়ারলি প্লেস রিজার্ভেশন অফিসের বুকিং কাউন্টারে বসে সারাদিন সবার কাছ থেকেই শুধু একশ'টাকার নোট হাতে নিতে নিতে দেশের মানুষের সম্পর্কে ধারণা বদলে যায়। তাও কী দু' একটা নোট? প্রত্যেকেই দু'পাচ দশটা একশ' বের করেন।

এক্সকিউজ মী। তিন তারিখে কালকা মেলে দুটো এয়ারকণ্ডিশনড ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট হবে?

এক ঝলক সামনের দিকে তাকিয়েই অজয়বাবু বুঝলেন ভদ্রলোক বাঙালী হলেও বিদেশে থাকেন। স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ। তারপর দৃষ্টিটা গুটিয়ে খাতাপত্তর উল্টোতে উল্টোতে বললেন, পাবেন।

রিজার্ভেশন স্লিপ এগিয়ে দিয়ে ভদ্রলোক বললেন, একটা অনুরোধ আছে।

রিজার্ভেশন স্লিপটা হাতে নিয়ে অজয়বাবু বললেন, বলুন।

কোন দ্বিধা সঙ্কোচ না করে উনি একটু হাসতে হাসতে বললেন, বহু দূরে থাকি। বিয়ে করতে কলকাতা এসে ক'দিনের জন্য হনিমুনে সিমলা যাচ্ছি। যদি কাইণ্ডলি··

ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে অজয়বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, কুপে চাইতো?

দ্যাটস রাইট।

প্যাসেঞ্জারদের নামের পর দিয়ে চোখ বুলিয়েই বললেন, মনে হয় পেয়ে যাবেন।

আপনি কনফার্ম করতে পারেন না?

না।

কেন?

ফাইনাল চার্ট তৈরী হবার সময়ই এসব এ্যালটমেন্ট হয়। তবে আমি লিখে

রাখছি ; মনে হয় পেয়ে যাবেন।

অশেষ ধন্যবাদ।

দুটো টিকিট হাতে নিয়ে ডেট পাঞ্চ করার আগেই অজয়বাবু বললেন, তেরোশ'টাকা আর দশ পয়সা দিন।

সঙ্গে সঙ্গে একশ' টাকার তেরোটা নোট আর দশ পয়সা এগিয়ে এল। এবার দুটো টিকিটে ডেট পাঞ্চ করে রিজার্ভেশন স্লিপ দেখে নাম লিখতে গিয়েই চমকে উঠলেন। কে? মণিমালা? মণিমালা বিয়ে করল?

না, না, তা হতে পারেনা। ও যে কথা দিয়েছিল ...

অবিশ্বাস্য মন নিয়ে ঠিকানাটা আবার পড়লেন। এ বাড়ির ঠিকানা তো ও জীবনে ভুলবে না। কিছুতেই ভুলতে পারবে না। অসম্ভব। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ও এ বাড়িতে প্রতিদিন গিয়েছে। না গিয়ে থাকতে পারেনি। মণিমালাও থাকতে পারত না।

থাক, থাক, আজ আর কেমিষ্ট্রি পড়ব না।

কেন?

ইংলিশ টিউটোরিয়্যালের কাজ আছে। কাল কেমিষ্ট্রি পড়ব।

অজয়বাবু গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা করেন, কাল কি বার?

কাল তো শনিবার।

তাহলে?

তাহলে কি হল?

কাল তো আমি আসব না।

কেন?

কাল তো আমার আসার কথা নয়। তাছাড়া কাল আমার কাজ আছে।

আমাকে পড়ানো ছাড়া তোমার কোন কাজ নেই।

আরো কত কথা মনে পড়ে ওর। স্মৃতির পাহাড় জমে আছে মনে।

মুহূর্তের জন্য অজয়বাবু যেন সেই সব দিনগুলো ফিরে পান।

মণিমালা, একটা কথা বলব?

এমন করে অনুমতি চাইছ কেন? বিয়ের কথা বলবে নাকি? হাসতে হাসতে মণিমালা প্রশ্ন করে।

হাসির কথা নয় মণিমালা।

তার মানে?

বলছিলাম, আমাকে আর কাছে টেনো না, বরং আস্তে আস্তে··

আস্তে আস্তে কী করব ? তোমার সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ করব ?

হ্যাঁ।

তোমার বদলে তবে কী বাবার মক্কেলদের সঙ্গে মেলামেশা শুরু করব ? সব কিছু ঠাট্টা করে উড়িযে দেবার চেষ্টা করোনা। শেষকালে ··

চিনেবাদাম খাওয়া শেষ, ঝাল-নুন মাখা আঙুলগুলো চাটতে চাটতে মণিমালা নির্বিকার ভাবে শুধু বললো, তুমি বড্ড ভীতু।

দাদা, একটু তাড়াতাড়ি করবেন ? কাউণ্টারের ওপাশ থেকে মধ্যাহ্নের কাকের কর্কশ চিৎকারের মত এক ভদ্রলোকের বেসুরো গলা শুনতেই অজয়বাবু যেন সম্বিৎ ফিরে পান। তাড়াতাড়ি খাতায় লেখেন, মাস্টার সন্দীপন সরকার। তার নীচে মিসেস মণিমালা সরকার। দুজনের নামের পাশে ব্রাকেট দিযে দুটো টিকিট নম্বর লেখার পর মিঃ সরকারের অনুরোধও লিখে নিয়ে বললেন, যদি অসুবিধা না হয তাহলে তিন তারিখ দুপুরের দিকে একবার একটা টেলিফোন করবেন।

মিঃ সরকার বললেন, টেলিফোন কেন ? আমি বরং একবার আসব।

অত কষ্ট করার দরকার নেই। টু বী অন দ্য সেফ সাইড আমি বললাম ; তবে টেলিফোন না করলেও কোন চিন্তার কারণ নেই।

যদি কিছু মনে না করেন, আপনার নামটা জানতে পারি কী ?

চৌধুরী বললেই আমাকে ডেকে দেবে।

টিকিট দুটো হাতে নিয়ে মিঃ সরকার বললেন, অশেষ ধন্যবাদ।

ধন্যবাদের কী আছে ? এটা তো আমার কর্তব্য।

গুডবাই।

গুডবাই।

অজয়বাবু মুহূর্তের জন্য শূন্যদৃষ্টিতে ওর যাবার পথের দিকে চেয়ে রইলেন।

## কাঁটা

পুরানো পার্স থেকে নতুন পার্সের মধ্যে টাকাকড়ি, আইডেনটিটি কার্ড, ভিজিটিং কার্ড ভরে দিতে দিতে অপর্ণা আপন মনে হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি আর কতকাল আমার চুলের এই কাঁটাটা নিয়ে ঘুরবে বলো তো?'

ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে টাইয়ের নট বাঁধতে বাঁধতে বিমান শুধু বললো, 'চিরকাল'।

'এই পাগলামীর কোন মানে হয়?'

'হয় বৈকি।'

'বাই চান্স যদি লোকজনের সামনে পড়ে যায় তাহলে কি ভাববে বলো তো?'

'লোকের ভাবনা চিন্তা নিয়ে আমার এত ভাবনা কিসের?'

টাই বাঁধা হয়ে গেছে। অপর্ণা এসে কোট পরিয়ে দিল। পার্স, কাউন্টেন পেন, রুমাল, গাড়ির চাবি দিল। বিমান আরেকবার ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে ভাল করে দেখে নিয়েই ঘুরে দাঁড়াল। দু'হাত দিয়ে অপর্ণার মুখখানা তুলে ধরে বললো, 'চলি'।

'লাঞ্চে তো আসছ না?'

'না।'

'বিকেলে ফিরতে দেরী হবে নাকি?'

'আজকে কখনও দেরী হতে পারে? স্যার আর্থারের পার্টিতে সবাইকে যেতে হবে না?'

'তাহলে তুমি এলেই আমি তৈরী হব।'

বিমান অপর্ণার কানের কাছে মুখ নিয়ে একটু চাপা গলায় বললো, 'সেই ভাল। দুজনেই একসঙ্গে শাওয়ারের তলায় বা বাথটাবে···'

অপর্ণা আর শুনতে পারল না। স্বামীর কাছ থেকে নিজেকে একটু দূরে সরিয়ে নিয়ে বললো, 'যত দিন যাচ্ছে তত বেশী তুমি অসভ্য হচ্ছো।'

বিমান হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়েই চঞ্চল হয়ে উঠলো, 'সো সোর পর্ণা।

বাই বাই !'

পুরো নাম বিমান ব্যানার্জী। স্কটিশ ইলেক্‌ট্রিক্যালস্‌ কোম্পানীর এ্যাসিসট্যাণ্ট রিজিওনাল ম্যানেজার। সাড়ে তিন হাজার টাকা মাইনে ছাড়াও গুরুসদয় দত্ত রোডের কোম্পানীর ফ্ল্যাট, কোম্পানীর গাড়ি। ড্রাইভার পায়, কিন্তু বিমান নিজেই ড্রাইভ করে। অফিসে ওয়াল-টু-ওয়াল কার্পেট, লাল-কালো-সাদা তিনটে টেলিফোন। দুটি এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ে এ্যাসিসট্যাণ্ট হিমসিম খেয়ে যায় টেলিফোন আর টাইপরাইটার সামলাতে। ভাল অফিসারদের কপালে যেমন সুনাম দুর্নাম জোটে, বিমানেরও সেরকম সুনাম-দুর্নাম আছে। অন্যান্য অফিসাররা ওকে ডাকে বি, বি. বলে। বাঙালী ছোকরা কেরানীরা নিজেদের মধ্যে আলোচনার সময় কখনও বলে বিবি, কখনো বলে এরোপ্লেন ব্যানার্জী। ওরা যে যাই বলুক বিমান ব্যানার্জীর মত ব্রিলিয়াণ্ট অফিসার দুর্লভ। তিরিশ বছরেই এ্যাসিসট্যাণ্ট রিজিওন্যাল ম্যানেজার, পঞ্চাশ-পঞ্চান্নয় কি হবে ?

চীফ ক্লার্ক মিঃ বসাক বলেন, 'গরীব স্কুল-মাস্টারের ছেলে হয়েও শুধু ব্রিলিয়াণ্ট রেজাণ্ট করার জন্য বিলেত গেছে। সেখানেও ব্রিলিয়াণ্ট রেজাণ্ট করেই এ চাকরি পায। সুতরাং এ সব ছেলে চড চড করে উঠবেই। কেউ ঠেকাতে পারবে না।

ছোকরা কেরানীরা তর্ক করে না। চুপ করে সব শোনে। পরে ক্যান্টিনে আড্ডা দেওয়ার সময বলে, বসাক মশাইযের কাছে সব অফিসারই ব্রিলিয়াণ্ট। অফিসারকে শ্রদ্ধা ভক্তি না করলে কি কেউ এত উপরে উঠতে পারে ?

ভারতী স্কুলের পুরোনো দিনের জুনিয়র সেক্সনের বিভূতি মাস্টার এখন আর মুক্তারামবাবুর স্ট্রীটের সেই পোড়ো বাড়ির স্যাঁতসেঁতে ঘরে থাকেন না। আট দশ টাকার টিউশানী করার জন্যও সকাল-সন্ধ্যেয় টাট্টু ঘোড়ার মত দৌড়ে বেড়ান না। তিন মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। জলপাইগুড়ির আনন্দপাড়ায় পুরোনো ভাঙা বাড়ি নতুন করে দিয়েছে ছেলে। মাসে মাসে ব্যাঙ্কে পাঁচশো টাকা আসে ছেলের কাছ থেকে। এছাড়াও মাঝে মাঝেই মা-র কাছে মনি-অর্ডার আসে, 'মা শিবরাত্রির খরচের জন্য ৫০ টাকা পাঠালাম। আপনার শাড়ি ও সেমিজ পাঠিয়েছি আশা করি পেয়েছেন। চিঠি দেবেন। প্রণাম নেবেন। স্নেহধন্যা অপর্ণা।'

বিমান বিলেত থেকে ফিরে আসার পরও বিয়ে করতে চায় নি। বিয়ে

করার কোন পরিকল্পনাই ওর ছিল না। বোন-ভগ্নিপতিদের চাপে আর বাবা-মার অনুরোধে মাত্র দু'বছর হলো অপর্ণাকে বিয়ে করেছে। বিমানের মত অপর্ণাও অত্যন্ত ভাল ছাত্রী ছিল। ইকনমিক্সে ফার্স্ট'ক্লাস সেকেণ্ড হয়ে সাউথ ক্যালকাটা গার্লস কলেজে লেকচারার ছিল। দেখতে নিঃসন্দেহে সুন্দরী। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটাই পার্থক্য। বিমান গরীব স্কুল-মাস্টারের ছেলে। মুক্তারামবাবু স্ট্রিটের ভাঙা পোড়োবাড়ির একদল গরীব ভাড়াটের মধ্যে স্কুল কলেজের দিনগুলো কাটিয়েছে। আর অপর্ণা হচ্ছে স্টেটস্‌ম্যানের এ্যাসিসট্যাণ্ট এডিটরের মেযে। পাম এভিন্যুর নিজেদের বাড়িতেই বড় হয়েছে। ছোটবেলা থেকেই মোটর চড়েছে, টেলিফোন ব্যবহার করেছে। বিলেত যাবার আগেও বিমানকে বীণা সিনেমার পাশের একটা দোকান থেকে পয়সা দিয়ে টেলিফোন করতে হতো।

অতীত যাই হোক বিমানের মত স্বামীকে পেয়ে অপর্ণা খুশী। সুখী। যথেষ্ট গর্বও অনুভব করে।

বিয়ের মাস তিনেক বাদে স্বামীর পার্সের মধ্যে হঠাৎ চুলের কাঁটা দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'একি! তোমার পার্সের মধ্যে চুলের কাঁটা?'

দু'হাত দিযে অপর্ণার গলা জড়িয়ে ধরে মুখের সামনে মুখ নিয়ে বিমান বললো, 'এটা কবে থেকে আমার পার্সে আছে জান?'

'না। আমি তো আজই দেখছি।'

'কোথায় পেয়েছিলাম জান?'

'চুলের একটা কাঁটা পাওয়া কি খুব দুঃসাধ্য ব্যাপার?'

বিমান অপর্ণার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললো, 'বাসরে তোমার খোঁপা থেকে এই কাঁটাটা পড়ে গিয়েছিল। সবার চোখে ধুলো দিয়ে এটা আমি পকেটে পুরেছিলাম। তারপর থেকেই পার্সে। আমার নিত্যকার সঙ্গী।'

অপর্ণা খুশীতে স্বামীর কাঁধে মাথা রেখে শুধু বললো,' তুমি সত্যিই একটা পাগল।'

'তোমাকে নিয়েও পাগলামি করবো না পর্ণা, তাই কি হয়?'

অনেক দিন পরে আজ আবার অপর্ণা এই কাঁটাটার কথা জিজ্ঞাসা করতেই নতুন করে মনে পড়ল মুক্তারামবাবু স্ট্রীটের দিনগুলোর কথা। তিনতলার উত্তর দিকের কোণার ঘরের আরতির কথা। আর্যকন্যা বিদ্যালয়ে যাবারসময় ফুটপাতের

ওদিক থেকে তির্যক দৃষ্টিতে চেয়ে দেখার কথা। সিঁড়ি দিয়ে ওঠা নামার পথে হঠাৎ এক ঝলক হাসি। তারপর অনেক দিন পরে অনেক লুকিয়ে চুরিয়ে ভিক্টোরিয়ার পিছন দিকে আড্ডা দেবার কথা। আরতির খোঁপা থেকে একটা কাঁটা নেবার স্মৃতি।

গুরুদাস দত্ত রোড থেকে চৌরঙ্গীতে অফিস যাবার পথে সব কিছু মনে পড়ল। বিলেত থেকে ফিরে আসার পর কতবার মুক্তারামবাবু স্ট্রীটের পুরনো বাড়িতে গেছে, কতজনকে জিজ্ঞাসা করেছে, এক ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর রায়বাবু এখানে থাকতেন। তিনি কোথায় গেছেন বলতে পারেন ?

হাঁ করে বিমানের কথা শুনে ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন ? টাকা পেতেন নাকি ?'

'না, না, ওরই কিছু টাকা আমার কাছে আছে।'

বিমান সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতেই ভদ্রলোক স্ত্রীকে বললেন, 'ছোকরার কি মাথা খারাপ ? টাকা দেবার জন্য ফিরিওয়ালার মত ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

স্ত্রী হলুদের হাত শাড়িতে মুছতে মুছতে বিরক্তির সঙ্গে বললেন, 'কি জানি বাপু কি ব্যাপার'।

# তুতুল

শিউলী টিচার্স কমনরুমে ঢুকতেই শ্রাবণী বললো, এসেছিস ?

হাতের ব্যাগ আর ছাতিটা টেবিলের উপর রাখতে রাখতে শিউলি জবাব দেয়, এখনও তোর সন্দেহ হচ্ছে নাকি ?

অতসী রায় জিজ্ঞাসা করলেন, কবে এলি শিউলি ?

'কাল দিল্লী মেলে'।

'কলকাতার সব খবর ভাল তো ?'

'এমনি সব ভাল তবে মার শরীরটা বিশেষ সুবিধের নয়।'

বন্দনাদি ঘরে এসে শিউলিকে দেখেই বললেন, এসেছ শিউলি ? বাঁচিয়েছ। তোমার ঐ আণ্ডা-কাচ্চা বাচ্চাদের সামলাতে সামলাতে আমার প্রাণ বেরিয়ে গেছে।

শ্রাবণী সঙ্গে সঙ্গে বলল, বন্দনাদি। শিউলির ঐ অতগুলো আণ্ডা-কাচ্চা ? একে একে সব টিচার আসছেন। প্রায় সবাই শিউলিকে জিজ্ঞাসা করলেন, এসেছ ?

দিল্লীতে পুজোর ছুটি তো মাত্র কটা দিন। ঐ কটা দিন ছুটিতে কলকাতা যাওয়া হয় না। তবে গরমের ছুটিতে শিউলি প্রত্যেকবার কলকাতায় যায়। যাবেই। দু'মাস ছুটি ও দিল্লীতে বসে নষ্ট করে না। ছুটি হবার সঙ্গে সঙ্গে ও ছুটে যায় কলকাতা, কিন্তু ছুটি শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে কিছুতেই ফিরতে পারে না। প্রত্যেকবার দু'তিন দিন দেরী হবেই। এবারের মত এক সপ্তাহ দেরী করে কোনদিন ফেরেনি। শিউলি জানে দেরী করে এলে অন্য টিচারদের কষ্ট হয়, প্রিন্সিপ্যালকে অনেক অসুবিধায় পড়তে হয়। ও চায়না দেরী করে ফিরতে কিন্তু দেরী হয়ে যায়। কি করবে ? এত লোকজনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে হয় যে দু'মাস ধরে ঘুরেও সবাইকে খুশী করা যায় না। বছরে একবার করে গেলে এই অসুবিধা।

সান্ত্বনা শুধু একটা। এখন বছরের শুরু। সব ছেলেমেয়েরা এখনও নতুন বই কেনে না। পড়াশুনার বিশেষ ক্ষতি হয় না কারুর।

ফার্স্ট বেল পড়ল।

প্রিন্সিপ্যাল টিচার্স কমনরুমে দরজার কাছে দাঁড়িয়েই জিজ্ঞাসা করলেন, সবাই এসেছেন তো ?

শ্রাবণী বলল, শিউলি যখন এসেছে তখন নিশ্চয়ই আর কেউ বাকী নেই। শিউলি আর শ্রাবণী একই সঙ্গে আশুতোষে পড়ত। অনেককাল হারিয়ে গিয়েছিল ওরা দুজনে। তারপর দিল্লীতে এসে শ্যামাপ্রসাদ স্কুলে মাষ্টারী করতে গিয়ে দুই বন্ধুর দেখা। শ্রাবণী এম এ, বি টি, হয়েছে, উঁচু ক্লাসে পড়ায়, আর শিউলি পাস কোর্সে বি,এ পাস করে আর এগুতে পারেনি। এমনকি ট্রেনড্ ও নয়। ক্লাস টু-থ্রী-ফোরে পড়ায়। প্রিন্সিপ্যাল চলে যাবার পর পরই সেকেণ্ড বেল পড়ল। একে একে সব টিচাররা বেরিয়ে গেলেন। প্রেয়ার। প্রার্থনা। তারপর লাইন করে ছেলমেয়েরা ক্লাসে এলো। টিচাররাও এলেন নিজেদের ক্লাসে। শিউলিও এলো।

সারা ঘরটা বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েতে ভর্তি। শিউলি একবার চোখ বুলিয়ে নিল সবার মুখের উপর দিয়ে। এদের নিয়ে একবছর ঘর করতে হবে। সেই সামনের বছর গরমের ছুটির আগে পর্য্যন্ত। ভাবতে গিয়ে শিউলির মনটা খারাপ হয়ে গেল। পড়াতে ইচ্ছা করল না। এতদিন কলকাতায় কাটিয়ে এসেই পড়াতে মন চায় না। প্রত্যেক বছরই ?

আমাকে তোমরা চেনো ?

যারা এই শ্যামাপ্রসাদ স্কুলেই ক্লাস ওয়ানে পড়েছে তাদের কয়েকজন প্রায় একসঙ্গে চীৎকার করে উঠল, আপনি তো ছিউলিদি।

'ছিউলিদি না, শিউলিদি।'

একটু চুপচাপ।

'তোমাদেরও তো আমাকে চিনতে হবে, তাই না ?'

কেউ কোন কথা বললো না। কেউ মুগ্ধ হয়ে, কেউ অবাক হয়ে চেয়ে রইল শিউলির দিকে। ও এবার এক একজনের নাম জিজ্ঞাসা করল, কি নাম তোমার ?

'রঞ্জন'।

আঙুল দিয়ে পাশের ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করল, তোমার ?

'অমিয়'।

'তোমার ?'

'বাদল।'

'তোমার ?'

'মায়া।'

'তোমার ?'

'বীণা।'

'তোমার ?'

'চন্দনা।'

'তোমার ?'

'মিত্রা।'

আস্তে আস্তে সবার নাম জেনে নেয় শিউলি। 'তোমার নাম কি ?'

'তুতুল।'

শিউলি একটু যেন চমকে উঠল। আপন মনেই বললো, তুতুল !

'হ্যাঁ, আমার নাম তুতুল।'

মাঝে মাঝে অতি সাধারণ একটি ঘটনা, একটা দৃশ্য, একটা কথা, একজন মানুষের নাম, একটি গান, একটা লেখা হঠাৎ মানুষকে চমকে দেয়, পুরানো দিনের স্মৃতির ঝড় ওঠে। পাহাড়ের বুকে ছোট্ট একটা ছিদ্র পেলেই তা ঝর্ণার জল বেরিয়ে আসে।

তুতুল !

শিউলি একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। মনে পড়ল সতীশ মুখার্জী রোডের দিনগুলো। অনিলের কথা। অনেক দিনের অনেক কথা। ছোট্ট ছোট্ট টুকরো টুকরো স্মৃতি, সব মিলিয়ে সুন্দর একটা কাহিনী। দুজনের বসন্তোৎসবের ইতিহাস।

সব সময় সে সব দিনের স্মৃতি, অনিলের কথা মনে পড়ে না। তবে এখনও কলকাতা গেলে সতীশ মুখার্জী রোড দিয়ে যাতায়াত না করে পারে না। হাজরা রোডের ওদিক থেকে জনক রোডে ভাসুরের বাড়ী আসার সময় শিউলি ঐ পথ দিয়েই আসবে। দিলীপবাবু ওকে বলেন, চল রসা রোড দিয়ে যাই। এই সমস্ত অলি-গলি দিয়ে যাবার কোন অর্থ হয় ?

শিউলি শুধু বলে, এই দিক দিয়েই এসো। ঐ রসা রোডের ভীড় ঠেলতে আর ভাল লাগে না।

দিলীপবাবু যখন টোপর মাথায় দিয়ে শিউলিকে আনতে যান, তখন ওরা সতীশ মুখার্জী রোড ছেড়ে ঢাকুরিয়া চলে গেছে। জানেন ওরা এ পাড়ায়

ছিল, কিন্তু জানেন না শিউলির মনের মধ্যে কত স্মৃতি জমে আছে, কত টুকরো টুকরো স্বপ্ন উঁকি দেয়।

তুতুল!

সিটি কলেজের ম্যাগাজিনে অনিলের লেখা গল্পটার কথা মনে পড়ল। 'শিউলি, সব কথা তোমাকে বলতে পারি না, কিন্তু অনেক কথা বলতে ইচ্ছে করে। গল্পটা পড়ো।'

শিউলি পড়েছিল। অনেকদিন, অনেকবার। সুযোগ পেলেই যখন তখন পড়ত।

'তোমার বুঝি তুতুল নামটা খুব পছন্দ?'

অনিল পাল্টা প্রশ্ন করেছিল, কেন, তোমার পছন্দ হয় না?

'না না, পছন্দ হবে না কেন? এত মিষ্টি নাম কারো অপছন্দ হয়? তুতুল নামটা শুনলেই মনে হয়, তোমার মত মিষ্টি, সুন্দর, আদুরে 'বলতে বলতেই অনিল শিউলির গালটা টিপে দেয়।

সে সব দিনের কথা, সেই ক্ষণস্থায়ী বসন্তের স্মৃতি মনে পড়লেই শিউলি উদাস হয়ে আরো কত কি ভাবে। ভাবল ওর বাবার নাম জিজ্ঞাসা করে। পারল না। হঠাৎ ওর বাবার নাম জিজ্ঞাসা করবে কেন?

'তোমার নাম?'

'শঙ্কর'।

'তোমার?'

'দিলীপ।'

'তোমার?'

'অশোক।'

'কি নাম তোমার?'

'মিতা!'

'তোমার?'

'সোমা'।

পরের দিন যখন স্কুলে এলো তখন শিউলি সব নাম ভুলে গেছে। শুধু মনে আছে তুতুলকে। অনিল যেমন ভাবত, ঠিক সেই রকম মিষ্টি সুন্দর, আদুরে।

দিনের পর দিন চলে যায়, মাসের পর মাস ফুরিয়ে যায়। ক্লাসের সব ছেলে-

মেয়ের নামই শিউলির মুখস্ত। ক্লাসের মধ্যে তুতুলকে আদর করে না, করতে পারে না,। ক্লাসের বাইরে, বারান্দায়, সিঁড়িতে, সামনের মাঠে ওকে একটু কাছে পেলেই শিউলি টেনে নেয় দু'হাত দিয়ে। আদর করে।

পর পর দুটো টার্মিন্যাল পরীক্ষায় তুতুল ভালই রেজাল্ট করল। শুধু বানান ভুল করে বলে ইংরেজীতে একটু কম নম্বর পেয়েছে। 'তুতুল, ইংরেজী বানান কেন ভুল হয় বাবা?'

তুতুল চুপ করে দাঁড়িয়ে মিটমিট করে তাকিয়ে দেখে শিউলিদিকে।

'তোমার বাবা এখানে আছেন তো?'

'হ্যাঁ।'

'একদিন তোমার বাবাকে আসতে বলবে।'

পরের দিন ফার্স্ট পিরিয়ড শুরু হবার পর পরই একজন ভদ্রমহিলা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আসতে পারি?

শিউলি দরজার দিকে একটু এগিয়ে এলো, বলুন।

'আমি মিসেস সরকার, তুতুলের মা।'

চমকে উঠল শিউলি! শিউলিদি! মিসেস শিউলি ব্যানার্জী। কোন মতে নিজেকে সামলে নিয়ে বললো, ভারী সুন্দর ছেলে তুতুল, কিন্তু একটু অন্যমনস্ক বলে ইংরেজী বানান বড় ভুল করে।

তুতুলের মা একটু হাসলেন। 'জানি'।

'আপনি একটু দেখবেন।'

'দেখব তো ভাবি, কিন্তু ··'

'কিন্তু কি?'

তুতুলের মা আবার হাসলেন, 'ওর বাবা ওকে কিছুতেই পড়তে দেন না'।

'কেন?'

'ওর বাবা কলকাতার সিটি কলেজের ছাত্র ছিলেন···'

'কোন কলেজের?'

'সিটি কলেজের। তাই বলেন, সিটি কলেজে পড়ে যদি আমরা ইংরেজী শিখতে পারি তাহলে এদের জন্য চিন্তা করো না।'

দুজনেই হাসলেন।

তুতুলের ক্লাস টিচার বললেন, ভারী মজার লোক তো!

মিসেস সরকার বললেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই! বিয়ের পর আমার

নামটাই পাল্টে দিল।

'সেকি ?'

'সত্যি বলছি। আমার নাম পারুল, কিন্তু বিয়ের পর ও আমার নাম দিল শিউলি।'

হঠাৎ শিউলিদি ঘুরে দাঁড়িয়ে ছেলেমেয়েদের দিকে ফিরে চীৎকার করলেন আঃ! চেঁচামেচি করো না।

তুতুলের মা বললেন, 'আচ্ছা আমি চলি।'

'আচ্ছা।'

'নমস্কার।'

শূন্য দৃষ্টিতে শিউলি তুতুলের দিকে চেয়ে রইল।

# আলোয় আলো

দিন আসে, দিন যায়। আজকের স্মৃতি চাপা পড়ে, কখনও কখনও হারিয়ে যায়। কিন্তু মাঝে মাঝে এমন দিন আসে যখন সামনের চোখ দুটো দিয়ে শুধু পিছনের দিনগুলোই দেখা যায়। শুধু ফেলে আসা দিনগুলোর কথাই মনে পড়ে। ভাবতে হয়। ভাল লাগে। নতুন কিছু ভাবতে মন চায় না, ইচ্ছা করে না। হয়তো প্রয়োজনও হয় না।

আজ আমার এমন একটা দিন। আমি থমকে দাঁড়িয়েছি। এগুচ্ছি না। এগুতে চাই না। ঘুরে দাঁড়িয়ে পিছনের দিকে দেখছি। সব কিছু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। জীবন্ত দেখতে পাচ্ছি। পঁচিশ বছরের খুঁটিনাটি।

অঞ্জলি পাশে শুয়ে ঘুমুচ্ছে। কাল অনেক রাত্রে ঘুমিয়েছে। ও আমার মত রাত জাগতে পারে না। নটা বাজলেই ওর বড় বড় চোখ দুটো ছোট হয়ে আসে। আমার বড় কষ্ট হয়। আমি ওকে একটু কাছে টেনে নিয়ে আদর করি। বলি, যাও শুয়ে পড়।

তোমার বুঝি অনেক রাত হবে?

না, আজ আর বেশী রাত করব না। আর তিন-চার পাতা লিখলেই এই চ্যাপ্টারটা শেষ হয়ে যাবে।

তাহলে একসঙ্গেই শোব।

অনেক করে বোঝাবার পর ও রাজী হয়। কিন্তু বলে, তুমি শোবার সময় ডাকবে তো?

কথা দিই, ডাকব।

অন্যদিন অঞ্জলি এমন সময় উঠে পড়ে। আজ ওঠেনি। ঘুমুচ্ছে। এত লম্বা ট্রেন জার্নি করে ও দারুণ ক্লান্ত হয়েছিল। তারপর অত রাত। আমি ওর ঘুম ভাঙাব না। আমি একটু নড়াচড়া করলে ওর ঘুম ভেঙ্গে যেতে পারে বলে চুপচাপ শুয়ে আছি। উঠছি না। ওকে দেখছি, দেখছি বাইরের আকাশ।

ভাবছি। পঁচিশ বছরের সব কিছু ভাবছি।

তখন আমার জীবনে বসন্তকাল। আমেদাবাদ থেকে বি এ পাশ করে

বাম্বেতে এম, এ পড়ছি। হোস্টেলে থাকি। দুদিন ছুটি পেলেই বাড়ি আসি। হীতেন আর নবীনের সঙ্গে কাকারিয়া লেকের ধারে বেড়াতে যাই। বেশ কাটছিলো দিনগুলো। শুধু একটা দুঃখ। ইচ্ছা ছিল গুজরাটি নিয়ে পড়ব, অধ্যাপক হব, কিন্তু ভর্তি হলাম ইংরেজীতে। নানাজনের পরামর্শের কাছে আমার ইচ্ছা হেরে গেল। তবু আমি হার স্বীকার করলাম না। সারা দিনরাত গুজরাটি পড়ি। একটু-আধটু লিখি।

বসন্ত বড় বিশ্বাসঘাতক। কখন আসে কখন যায়, তার ঠিক ঠিকানা নেই। মানুষের মনের বাঁধুনি ঢিলে করে পালিয়ে যায়। আমার মনে তখন অনেক স্বপ্ন, চোখে নানা রং এর মেলা, কিন্তু বসন্ত পালিয়ে গেল। বাবা মারা গেলেন। আমি বোম্বে ইউনিভার্সিটি ছেড়ে রেবধি বাজারের দোকানে বসতে শুরু করলাম।

ছোট স্টেশনারী দোকান। এই দোকানের উপরেই তিনটি ছোট ছোট ভাইবোনের লেখা পড়া, আমার আর মা'র জীবিকা। রোজ সকালে যাই, ফিরে আসি রাত্রে। ভাবি কিছু পড়ব, কিছু লিখব, কিন্তু পারি না। ঘুমে চোখ বুঁজে আসে। খেয়েই শুয়ে পড়ি। রোজ। মাসের পর মাস।

দোকানদারী করতে ভাল লাগত না। মন বসত না। মনে হত আমি যেন হারিয়ে যাচ্ছি নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছি। শো-কেসের উপর ভর দিয়ে চুপচাপ বসে থাকতাম। প্রায় প্রাণহীন একটা জড়পদার্থের মত। শুধু খদ্দের এলে জাপানী পুতুলের মত নড়াচড়া করতাম। তেল, সাবান, চুলের ফিতে, শেভিং ব্রাশ, সেফটিপিন শো-কেসের উপর ছড়িয়ে দিতাম। দাম বলতাম। কোন খদ্দের ভাবনা-চিন্তা কিছু করতেন না। অনেক খদ্দের ভাবতেন আমি বেশী দাম চাইছি, তাদের ঠকাচ্ছি। আমি বুঝতে পারতাম ওদের মনের কথা, কিন্তু কিছু বলতাম না। তর্ক করতাম না। মা বলেছিলেন, দেখ বাবা, খদ্দেররা যেন রাগ না করে। খদ্দেররা অসন্তুষ্ট হলে কিছুতেই দোকান চলবে না, আর তাহলে পাঁচটি প্রাণী না খেয়ে মারা যাব।

ভয় নেই মা, আমি কারুর সঙ্গে রাগারাগি বা খারাপ ব্যবহার করব না।

তুই তো ব্যবসা করতে চাস না, তাই ভয় হয় কখন রাগারাগি করলি, কখন দোকান বন্ধ করেই চলে আসিস।

আমার বাবা অত্যন্ত সাধারণ হলেও সৎ লোক ছিলেন। রেবধি বাজারের অনেক ব্যবসাদারদের মত বাবা লাখ টাকার মালিক না হয়েও সুখী মানুষ

ছিলেন। কোন হতাশা ব্যর্থতার গ্লানি ছিল না তাঁর মনে। তাই তো মা বাবাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। শ্রদ্ধা করতেন। পরলোকগত স্বামীর স্মৃতি-বিজড়িত ঐ ছোট্ট স্টেশনারী দোকনটাকেও মা বড় ভালবাসতেন। ভালবাসত আমার ছোট ছোট তিনটি ভাইবোন। কদাচিৎ কখনও ওরা মা'র সঙ্গে দোকানে গেলে বাবা হয়ত প্লাষ্টিকের রঙিন স্কেল বা দু-চারটে টফি বা ঐ রকম সামান্য কিছু দিলে ওরা আনন্দে খুশীতে ফেটে পড়ত। আমি কলেজ থেকে বাড়ি এলে ওরা চড়ুই পাখীর মত কিচির মিচির করে আমাকে ঘিরে ধরে ঐসব দেখাত। স্কুলে নীচু ক্লাসে পড়ার সময় কখনও কখনও বাবার সঙ্গে দোকানে গেলেও পরে আমি দোকানে যেতাম না। ইচ্ছে করত না, ভাল লাগত না। কিন্তু ওরা তিনজনে দোকানে যাবার নাম শুনলেই নাচতে শুরু করত। ভিতরের ঘরের বড় ট্রাঙ্ক থেকে ভাল ভাল জামা-কাপড় বের করে পরত। বাবা মারা যাবার পর আমি যখন দোকানে বেরুতে শুরু করলাম, তখন ওরা কেউ যেত না। যেতে চাইত না। বোধহয় ভয় করত। বোধহয় ভাবত আমি রাগ করব। মা-ও কিছু বলতেন না। হঠাৎ একদিন দেখলাম গুলু একটা ভাঙা স্কেল দিয়ে খাতায় লাইন টানছে। বড় কষ্ট হল। মনে হল ওরা পিতৃহীন হয়েছে ঠিকই, কিন্তু অনাথ তো নয়।

মা, আজ তুমি গুলুদের নিয়ে একবার দোকানে আসবে?

না বাবা, আমি দোকানে যাব না।

কেন?

দোকানে গেলেই যে পুরানো স্মৃতি মনে পড়বে, কষ্ট হবে, মা তা স্বীকার করতে পারল না। বললেন. অতটা পথ আর হাঁটতে পারি না।

হাঁটতে না পারলে সাইকেল রিক্সা করে যেও।

রিক্সা করে যাতায়াত করা মানেই দেড়টা টাকা।

বলু আর মীনুর স্কুল সকালে। ওরা বাড়ি ছিল না। আমি গুলুকে ডেকে বললাম, স্কুল থেকে এসে একটা রিক্সা করে মাকে নিয়ে তোরা দোকানে আসিস।

ওরা এসেছিল। তিন ভাই বোনকে নতুন স্কেল, বড় বড় পেন্সিল আর টফি দিয়েছিলাম। সেদিন ওদের আনন্দ দেখে আমার চোখে প্রায় জল এসেছিল। মাকে দু'শ টাকার নোট দিয়ে বললাম, ওদের স্কুলে যাবার জামার ছিট কিনে নাও। মা আপত্তি করেছিলেন। কিন্তু আমি শুনিনি। জোর

করেই মাকে ছিট কিনতে পাঠিয়েছিলাম।

দোকানে কলগেট পেস্ট ফুরিয়ে গিয়েছিল। ভেবেছিলাম এক ডজন পেস্ট কিনব, কিন্তু হল না। দুজন খদ্দের ফিরে গেল ঠিকই তবে দুঃখ পেলাম না। বরং এতদিন পর ভাই বোন আর মাকে খুশী করতে পেরে মনে হল সারা রেবধি বাজারের সব দোকানদারকে হারিয়ে দিয়েছি।

সেই সেদিন রাত্রে মাকে কথা দিই, এ দোকান আমি কোনদিন ছাড়ব না।

সত্যি ছাড়িনি। রেবধি বাজারের ঐ ছোট স্টেশনারী দোকান আমি ছাড়িনি। ছাডতে পারিনি। প্রথম কিছুদিন দোকানদারী করতে ভাল লাগত না ঠিকই, কিন্তু আস্তে আস্তে আমার মনের, দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হল। ভালবাসলাম রেবধি বাজারকে, ভাল লাগল অফুরন্ত জনস্রোতকে।

যা ছোট, ক্ষুদ্র সামান্য সীমিত, তা বেশীক্ষণ বেশীদিন ভাল লাগে না। সীমাহীন আকাশ, উদার প্রান্তর, নিত্য প্রবহমান গঙ্গা-গোদাবরী, সিন্ধু-কাবেরী, অতুাচ্চ হিমালয় যুগ যুগ ধরে ভাল লাগছে। লাগবে। সবরমতীর জল শুকিয়ে যায় কিন্তু রেবধি বাজারের মানুষের প্রবাহ গঙ্গা-গোদাবরীর মত নিত্য প্রবহমান। এর যেন আদি নেই অন্ত নেই।

অঞ্জলি একবার পাশ ফিরল। একটা হাত আমার উপর এসে পড়ল। ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও কি ও আমার উপর নির্ভর করে?

অঞ্জলির হাতের উপর আমার দুটো হাত রাখলাম। মনে মনে বললাম, অঞ্জু. রেবধি বাজারের ঐ জনস্রোতকে যদি ভাল না বাসতাম, তাহলে কি কোনদিন তোমার দেখা পেতাম? না, পেতাম না। গঙ্গার দু-কূলে কত কল-কারখানা, কিন্তু কারখানার চিমনির কালো ধোঁয়া দেখে যদি কেউ ফিরে আসে তাহলে কি সে স্নিগ্ধ বটের ছায়ায় জীর্ণ মন্দিরে জাগ্রত বিগ্রহ দেখতে পায়?

সেদিনের কথা মনে পড়লে হাসি পায়। কত সামান্য, কত সাধারণ সে ঘটনা।

খদ্দের না থাকলে একটা না একটা নতুন-পুরনো ম্যাগাজিন পড়ি। কখনও বা চেয়ে থাকি রাস্তার দিকে। মানুষ দেখি। কখনও আবার গল্প উপন্যাসের বই পড়ি। খদ্দের এলেই হাতের বই ম্যাগাজিন সরিয়ে রাখি। খদ্দের চলে গেলেই আবার তুলে নিই, পড়ি। রেবধি বাজারের ঐ ছোট্ট

স্টেশনারী দোকানে বসে বসেই পুরানো দিনের স্বপ্ন দেখি। কখনও আমি অধ্যাপক, কখনও লেখক। গল্পকার, ঔপন্যাসিক। রমনলাল বসন্তলাল দেশাইয়ের মত জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক। ধূমকেতুর মত জনপ্রিয় গল্প লেখক। শুধু ভাবি আর পুরনো 'বিসমি সাদি' বা 'গুজরাটে'র গল্প-উপন্যাস বারবার পড়ি। খদ্দের না থাকলেই পড়ি।

মেয়েটি অনেককাল ধরেই আমাদের দোকানের খদ্দের। নাম-ধাম জানি না, কোথায় থাকে, কি করে—কিছুই জানি না। জানার দরকার হয়নি, আগ্রহ হয়নি। শুধু মুখটা পরিচিত। পুরোনো খদ্দের বলে খাতির করি। মেয়েটি সেদিনও এসেছে। তেল সাবান চুলের ফিতে মুখে মাথার ক্রীম পেটিকোটে লাগাবার লেস—কিছুই চাইল না। দোকানে এসেই বলল, যখনই আপনার দোকানে আসি তখনই আপনাকে এই দুটো ম্যাগাজিন নিয়ে ভাবতে দেখি। কি ব্যাপার বলুন তো?

আমি হাসলাম।—খদ্দের না থাকলে এই একটু উল্টে-পাল্টে দেখি।

আর কোন কাগজ তো কখনও আপনার হাতে দেখি না। এবার একটু হাসল মেয়েটি, আপনার হাতে সব সময় বিসমি সাদি থাকে বলে আমরা আপনার দোকানের নামই দিয়েছি বিসমি সাদি।

খুব মজা লাগল। হাসলাম।

সেদিন কিছু না বললেও বেশীদিন চেপে রাখতে পারিনি। একদিন স্বীকার করলাম, সারা জীবন ধরে ভেবেছি আমি অধ্যাপক হব, লেখক হব—কিন্তু হল না। হেরে গেলাম।

কেন?

বাবা মারা গেলেন বলে এম. এ. পড়তে পড়তেই দোকানে বসতে হল··

অধ্যাপক হতে পারলেন না বলে কি লেখকও হতে পারবেন না?

রেবধি বাজারে বসে দোকানদারী করলে কি গল্প-উপন্যাস লেখা যায়?

গল্প উপন্যাস লিখতে হলে বুঝি রাজপ্রাসাদে থাকতে হয়? বড় বড় চোখ দুটো তুলে সোজাসুজি আমার দিকে তাকিয়ে বলল, মানুষের মাঝখানে থেকে মানুষের সুখ-দুঃখ যে সত্যি করে উপলব্ধি করে, সেই তো গল্প লিখতে পারে, উপন্যাস লিখতে পারে।

ঐ একটা চাবুকের ঘা খেয়েই আমি সোজা হয়ে দাঁড়ালাম। ঠিক তিন মাস পরে 'গুজরাটে' আমার প্রথম গল্প বেরুল, 'রেবধি বাজার'। নিজের

নামে লেখার সাহস হল না, লিখলাম ছদ্মনামে।

ঠিক দু'দিন পর মেয়েটি এসে হাজির। মুখে চাপা হাসি, চোখে একটু কৌতুকের ইঙ্গিত।

কি দেব বলুন ?

প্রথম গল্প হলেও খুব ভাল হয়েছে।

তার মানে ?

আপনি লিখুন। মন দিয়ে লিখুন। একদিন আপনি সত্যি নাম করবেন।

ঠিক পঁচিশ বছর আগেকার কথা, কিন্তু কিছু ভুলিনি। এসব কথা কি কেউ ভুলতে পারে ? আমি ভুলিনি, ভুলব না সে-সব দিনের কথা, স্মৃতি। তোমার ঐ চাবুকের বাড়ি পিঠে না পড়লে সারা জীবনই আমি রেবথি বাজারে দোকানদারী করতাম আর চোরের মত লুকিয়ে লুকিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতাম। যে রেবথি বাজারকে ঘেন্না করতাম, সে রেবথি বাজারে দোকানদারী করার জন্য অহর্নিশি মনে মনে চোখের জল ফেলতাম। সেই রেবথি বাজারে দোকানদারী করতে করতেই আমি গল্প লিখলাম, উপন্যাস লিখলাম, সাহিত্যিক হলাম। অঞ্জু, তোমার ঐ চাবুকের ঘা না খেলে হয়তো বেশীদিন দোকাদারী করতে পারতাম না, মার কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, বোধহয় তার সম্মান রাখতে পারতাম না। হয়তো ব্যর্থ হতাম ঐ ছোট ছোট তিনটি ভাইবোনের মুখে হাসি ফুটিয়ে রাখতে।

এই পঁচিশ বছর কত কি ঘটল। মা মারা গিয়েছেন, মীনুর বিয়ে হয়েছে, দুটি ভাই লেকচারার। অঞ্জুর সঙ্গে আমার বিয়ে হল। দুটি ভায়েরও বিয়ে দিলাম। সেই ছোট্ট মীনুর মেয়েই আজ কত বড় হয়ে গেছে। গুণু আর বলুর তিনটে ছেলেই কি দারুণ গুণ্ডা হয়েছে। যখনই আমেদাবাদে আসে রোজ আমার সঙ্গে দোকানে আসবে আর সারাদিন টফি চকলেট খাবে। বাচ্চাদের অত মিষ্টি খাওয়া খারাপ, কিন্তু আমি বাধা দিতে পারি না। বেশ মজা লাগে। শুধু আমাদেরই কোন ছেলে মেয়ে হল না।

তুমি কখনো এ কথা বলবে না তো! অঞ্জু আমাকে শাসন করে, তোমার লেখা ঐ বইগুলোই আমাদের ছেলেমেয়ে।

কাল অত রাত্রে শুয়েও এত ভোরে ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমার জীবনে এমন দিন যে কোনদিন আসবে, তা আমি কল্পনাও করিনি। কিন্তু তবু এল।

এসেছে সন্ধ্যের পর বিজ্ঞান ভবনের বিরাট মঞ্চে আমি সারা দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের সঙ্গে রাষ্ট্রপতির পাশে বসব। 'রেবধি বাজার' উপন্যাসের জন্য আমি সাহিত্য আকাডেমীর পুরস্কার পাব।

মঞ্চের পর্দা এখনও ওঠেনি। আমরা, যারা সাহিত্য আকাডেমীর পুরস্কার পাব, বসে আছি। মাঝখানের দুটি চেয়ার খালি। সাহিত্য আকাডেমীর সভাপতি আর রাষ্ট্রপতি বসবেন। অঞ্জলি প্রায় আমার সামনা-সামনি অডিয়েন্সের মধ্যে বসে আছে। রাষ্ট্রপতি এলেই এই মোটা ভেলভেটের পর্দা উঠবে, আমরা সবাই সামনের দিকে চেয়ে থাকব। রেবধি বাজারের যে নোংরা মানুষগুলোর মধ্যে দোকানদারী করতে করতে আমি সাহিত্যিক হয়েছি, যাদের সুখ দুঃখের কথা লিখে আমি আজকে এই পুরস্কার পাব, সম্মান পাব, তাদের এখানে দেখতে না পেলেও অনেক নতুন মানুষ দেখব। দেখব আমার অঞ্জুকে, যার চাবুকের ঘা খেয়ে আমি রেবধি বাজারকে ভালবেসেছি, সাহিত্যিক হয়েছি, যার ভালবাসায় আমি রাজপ্রাসাদে বাস না করেও রাজা হয়েছি। ও নিশ্চয়ই গর্বে আনন্দে মিটমিট করে হাসবে। আমিও একটু একটু হাসব। হাসতে হাসতে ওকে ভালবাসব, কৃতজ্ঞতা জানাব। পর্দা উঠেছে। আমরা উঠে দাঁড়িয়েছি। সাহিত্য আকাডেমীর সভাপতি রাষ্ট্রপতিকে নিয়ে মঞ্চে উঠছেন। উঠলেন। আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছেন। চেয়ারে বসবেন। বসলেন। আমরা বসলাম। সামনের দিকে তাকিয়েছি, কিন্তু কই, কাউকে তো দেখছি না। এত আলো যে সামনে কিছু দেখতে পাচ্ছিনা। সব অন্ধকার। নিঃস্তব্ধ। অঞ্জুকে দেখছি না, কাউকে দেখছি না। একটা শব্দও শুনতে পাচ্ছি না। এমন কি নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের আওয়াজ ও শুনতে পাচ্ছি না। এ কি প্রেতপুরী? এখানে কি কেউ বেঁচে নেই?

ভীষণ অস্বস্তিবোধ করছি।

অঞ্জু আছে তো? নাকি আমি হাসছি না বলে ও রাগ করে চলে গেল? রাষ্ট্রপতির হাত থেকে পুরস্কার নিচ্ছেন সাহিত্যিকরা। এক্ষুনি আমিও নেব। নিতে হবে। হ্যাঁ, ঐ তো আমার নাম ঘোষণা করা হল…ঐ তো বলল, ফর হিজ আউটস্ট্যাণ্ডিং নভেল 'রেবধি বাজার'। আমি উঠে দাঁড়িয়েছি, রাষ্ট্রপতির সামনে এসে দাঁড়িয়েছি, পুরস্কার নেব…বাবারে বাবারে বাবা। কি দারুন আলো! ফ্লাডলাইটের আলো। আমি আলোয় আলোয় অন্ধ হয়ে গেলাম। পুরস্কার নিলাম। রাষ্ট্রপতির সঙ্গে করমর্দন করলাম। রাষ্ট্রপতি হাসলেন কিন্তু

আমি হাসতে পারলাম না। ঘুরে দাঁড়ালাম। মাথা নীচু করে প্রণাম করলাম গঙ্গা গোদাবরীর মত নিত্য প্রবহমান জনস্রোতের উদ্দেশ্যে। রেবথি বাজারের মানুষগুলোর উদ্দেশ্যে। মুখ তুলে চাইলাম অঞ্জুকে দেখব বলে, কিন্তু না, দেখতে পেলাম না। আমার চারপাশে আলো। সামনে শুধু অন্ধকার, জমাট বাঁধা অন্ধকার। আমি কোন মানুষ দেখছি না, শুনছি না তাদের হাসি-কান্না। হয়তো আর কোনদিনই দেখব না, শুনব না। আমি যে সাহিত্য আকাডেমীর পুরস্কার পেলাম।

# রাত্রি

পাশ ফিরে শুয়েই পুরোনো দিনের কথা মনে হয় অনিলের। শুভ্রা ঘরে ঢুকেই বলত, তুমি আবার আলো অফ করে দিয়েছ ?

চোখে আলো লাগে যে।

শুভ্রা সুইচ টিপে আলো জ্বালিয়ে বলত, তা হোক। তুমি আলো অফ করবে না।

অনিলের দিকে তাকিয়ে শুভ্রা মুখ টিপে টিপে হাসে। মাত্র কয়েকটা মুহূর্ত। তারপর আলো অফ করে অনিলের পাশে এসে লুটিয়ে পড়ে। একটু আদর, একটু ভালবাসা, একটু মাতলামী। পর পর। ঢেউয়ের পর ঢেউ। কয়েকটা অবিস্মরণীয় মুহূর্ত। পলকে ভেসে যায়।

শুভ্রাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে অনিল বলে, আমি আলো অফ করেছিলাম বলে আমাকে তুমি বকাবকি করছিলে, কিন্তু ··

তোমাকে আমি বকেছি ?

না, ঠিক বকাবকি না করলেও ··

ঠিক বকাবকি করিনি মানে ? আমি তোমাকে বকব ? তুমি কি ভেবেছ বল তো ? এক নি শ্বাসে শুভ্রা অভিমানের সুরে বলে যায়।

অনিল আরো, আরো বেশী কাছে টেনে নেয় শুভ্রাকে।—আমি জানি তুমি আমাকে কোনদিন বকতে পারবে না।

তবে তুমি আমাকে দোষ দিচ্ছিলে যে ?

না, বলছিলাম কি আমি আলো অফ করি বলে রোজই তুমি···

তুমি আলো অফ করবে না। আমি আলো অফ করব।

তুমিও তো ঘরে ঢুকেই আলো অফ করে দাও।

ঘরে ঢুকেই আমি আলো অফ করি না।

আজও তো ঘরে ঢুকেই আলো অফ করলে।

ঘরে ঢুকেই না, ঘরে ঢুকে একটু পরে।

একটু পরে মানে কয়েক সেকেণ্ড এদিক ওদিক তাকিয়েই।

এদিক ওদিক মোটেই তাকাই না। একবার তোমাকে দেখে নিয়েই আলো অফ করি।

অনিল অবাক হয়, আমাকে দেখে নিয়ে?

হ্যাঁ। একটু বেশী রাত্তিরে টেবিল লাইটের আলোয় তোমাকে কি সুন্দর দেখায়, তা তুমি জানো?

শুভ্রার কথায় অনিল আত্মহারা না হয়ে পারে না।—তুমি আমাকে পাগল করে দেবে। আমাকে কেন এমন করে ভালবাস বলতো?

শুভ্রা হাসে। অনিলের মুখে মাথায় হাত দিয়ে আদর করতে করতে জবাব দেয়, তুমি ভালবাস বলেই আমিও তোমাকে ভালবাসি।

না, না, তোমার মত এত গভীর ভাবে আমি তোমাকে ভালবাসি না।

ওকথা বলো না। আমার মধ্যে হয়ত উচ্ছ্বাসটা একটু বেশী, কিন্তু তোমার মত এত গভীর ভাবে ভালবাসতে পারি না। জানি না।

দুজনেই দুজনকে ভালবাসে। গভীর ভাবে। সমস্ত মন দিয়ে। দিনের সূর্য রাতের অন্ধকারে হারিয়ে যায়, ভোরের আকাশে চাঁদ লুকিয়ে পড়ে, কিন্তু ওদের ভালবাসা কখনও হারিয়ে যায় না। লুকিযে পড়ে না। ওদের প্রেমের শিখা সব সময় মনের মধ্যে জ্বলে; দূর করে দেয় সব অন্ধকার।

আরো কতো দিনের কত কি মনে পড়ে যায় অনিলের।

দরজা খুলে দিয়েই শুভ্রা একবার ওর হাতের দিকে তাকাল।—প্যাণ্ট কই? দাঁত দিয়ে জিভ কেটে অনিল বলে, এই যা! একদম ভুলে গেছি।

কবে ডেলিভারী দেবার কথা ছিল?

শুভ্রার প্রশ্নে অপরাধীর মত অনিল জবাব দেয়, পরশু।

ঠিক আছে। তুমি আমাকে রসিদটা দাও তো।

তুমি এই প্যাণ্ট আনতে কনট্ প্লেস যাবে?

হ্যাঁ যাব।

অনিল শুভ্রার হাত ধরে ঘরের মধ্যে এনে বলে, তোমাকে যেতে হবে না। আমি কালকে ঠিক নিয়ে আসব।

তিনদিন ধরেই তো এই কথা শুনছি।

হাতের কাগজপত্রগুলো সেণ্টার টেবিলে রেখে অনিল শুভ্রাকে পাশে নিয়ে বসে। বলে, কাল যদি না আনি তাহলে তুমি আমাকে বাড়িতে ঢুকতে দিও না।

অইসব অবাস্তব কথা বলো না।

অবাস্তব কেন ?

তুমি সারাদিন পরে বাড়ি ফিরবে আর আমি তোমাকে বাড়ি ঢুকতে দেব না ?

অনিল শুভ্রার কানে কানে বলে, কাল যদি প্যাণ্ট আনতে ভুলে যাই তাহলে রাত্রে তুমি ধর্মঘট করো।

শুভ্রা হাসতে হাসতে মুখ সরিয়ে নেয়। বলে, আমাকে ধর্মঘট করতে বলছ কেন ? তুমি ধর্মঘট করতে পারো না ?

সেই রাত্রেই শুভ্রা অনিলকে বলল, দেখ, ভবিষ্যতে যদি কোনদিন আমাদের ঝগড়া-ঝাঁটি করতে হয় তাহলে দিনে করব।

কেন ?

রাত্রে তোমাকে না জড়িয়ে শুতেই পারব না।

অনিল হাসে।

হাসির কথা নয়, সত্যি বলছি। রাত্রে আমি রাগ করে থাকতে পারব না। শুভ্রা সত্যি রাত্রে রাগ করে অনিলের থেকে নিজেকে গুটিয়ে রাখতে পারত না। অনিল পাশ ফিরে শুয়ে থাকলেও ও আস্তে আস্তে, আদর করতে করতে ওকে নিজের কাছে টেনে নিয়েছে। নেবেই। যে ভাবেই হোক যত সাধ্য সাধনা করেই হোক ও স্বামীকে খুশী না করে নিজে সুখী হত না।

দিনে দিনে শরতের নীল আকাশ, হেমন্তের সৌরভ হারিয়ে গেল। অনিল শোবার পর দুটো-তিনটে সিগারেট শেষ করল। শুভ্রা তখনও ঘরের কোণায় সোফায় বসে বই পড়ছে। কি গো, শোবে না ?

শুভ্রা মুখ না তুলেই বলল, একটু দাঁড়াও।

ক'টা বাজে জানো ?

শুভ্রা কোন কথা বলে না! উপন্যাস পড়তে মত্ত।

সাড়ে এগারোটা বাজে।

বাজুক।

আমি কিন্তু এবার ঘুমিয়ে পড়ব।

ঘুমোও।

ঘুমিয়ে পড়লে ডাকাডাকি করো না।

শুভ্রা বই থেকে মুখ তুলে তাকায়।

আমি বই পড়তে বসলেই তুমি এত বিরক্ত কর কেন বল তো ?

বিরক্ত করছি ?

না, না, বিরক্ত করবে কেন ? আমাকে খুব শান্তিতে পড়তে দিচ্ছ। বলছিলাম ঘুমিয়ে পড়লে আমাকে আর ডাকাডাকি করো না।

শুভ্রা হাসে।—তুমি ঘুমিয়ে পড়লে আমি ডাকাডাকি করি ?

মানে করতেও তো পারো।

তা তো বটেই। শুভ্রা আবার উপন্যাসে ডুব দেয়, বলে, এক্ষুণি আসছি। ঘুমিও না।

একটু পরেই শুভ্রা আসে। অনিল শোবার পর বেশীক্ষণ নিজেকে দূরে রাখতে পারে না।

আমি না এলে কি তোমার ঘুম আসে না ?

না।

কেন ?

কেমন খালি খালি লাগে।

ঠিক বলেছ। হঠাৎ শুভ্রা জিজ্ঞাসা করে আমার ঘড়িটা আনবে না ?

আজ তো উনিশে। এই কদিন আর আনব না। সামনের মাসে মাইনে পেয়েই আনব।

ভাল কথা, ছোড়দার চিঠি দেখেছ ?

ছোড়দার চিঠি এসেছে নাকি ?

ও ঘরের টেবিলের ওপরেই তো রেখেছি। দেখতে পাওনি ?

ঠিক খেয়াল করিনি। ছোড়দা কি লিখেছে ?

ছোড়দির শরীর বিশেষ ভাল যাচ্ছে না বলে দু-এক মাসের জন্ত আমাদের কাছে পাঠাতে চান। ছোট বৌদির কি হয়েছে ?

সে সব কিছু লেখেননি। কবে পাঠাতে চায় ?

তাও লেখেননি। তবে মনে হয় তাড়াতাড়ি আসতে চায়।

লিখে দাও আসতে। ছোড়দা ওখান থেকে ডিলুক্সে বা রাজধানীতে চড়িয়ে দেবে, আমি এখানে নামিয়ে নেব।

শুভ্রা একটু চুপ করে থাকে। তারপর বলে, হ্যাঁ তা তো লিখতেই হবে, তবে ছোড়দি যা নোংরা।

ঠিক নোংরা না, বড্ড বেশী অগোছাল।

অগোছাল হওয়াই তো নোংরামী।

তা ঠিক।

ছোড়দির বাপের বাড়িটাও যেন কেমন কেমন।

তুমি ছোটবৌদির বাড়ি গিয়েছ ?

গতবার যখন কলকাতায় গিয়েছিলাম তখন ছোড়দা আমাকে দীঘা দেখাবেন বলে…

হঁ। হ্যাঁ মনে পড়েছে।

দূরের শীত কাছে এগিয়ে আসে। জড়তা আসে মানুষের দেহে। বোধহয় মনেও। সব কিছু যেন সঙ্কুচিত হয়।

তোমার ছেলের স্কুল নিয়ে তো আমি মহা মুশকিলে পড়েছি।

কেন, কি হোল ?

কতকগুলো বদ ছেলে ওর টিফিন কেড়ে খাবে।

সেকি ?

আর বলো না। কতকগুলো অশিক্ষিত বিজনেসম্যানের ছেলে এসে অন্য ছেলেগুলোকে জ্বালিয়ে মারছে।

কি আর করবে ? একটু বেশী করে টিফিন দিয়ে দিও।

সারাদিনের সব সঞ্চয় ঢেলে দেবার এই তো সময়। অবসর। সুযোগ।

অনিল সিগারেট ধরিয়ে একটা টান দেয়।—আমাদের এই নতুন ডেপুটি চীফ এঞ্জিনীয়ারটাও আমাদের একেবারে জ্বালিয়ে মারছে।

কলম্বো প্ল্যানে ক'বছর সিঙ্গাপুরে কাটিয়ে ভদ্রলোকের মেজাজটাই অন্য রকম হয়ে গেছে।

আচ্ছা, তুমি কলম্বো প্ল্যানে বাইরে যেতে পারো না ?

শুধু কলম্বো প্ল্যানে কেন, একটু ব্যাকিং থাকলে ইউনাইটেড নেশানস্-এর কত ভাল প্রজেক্টে চলে যেতে পারি।

তুমি একটু চেষ্টা করলেই পারো।

মিনিস্টার এম.পি আর বড় বড় অফিসারদের আত্মীয়-স্বজন ছাড়া বাইরের কেউ এসব সুযোগ পায় নাকি ?

আচ্ছা, তুমি গত মাসে যে নাগাল্যাণ্ড ঘুরে এলে তার টি-এ পেয়েছ ?

এত তাড়াতাড়ি আবার টি এ বিল কবে পাশ হয় ?

এদিকে আমার কাছে কতো পড়ে আছে জানো ?

কত ?

বড় জোর সত্তর আশী টাকা।

সেকি ?

সেকি মানে ? আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে যে তোমার রাঙাকাকার টিকিট কাটলে, সে টাকা ফেরৎ দিয়েছ ?

থাকলে তো দেব।

তা আমি জানি। কিন্তু তুমিও তো তোমার অবস্থা বুঝবে।

অনিলের সিগারেট শেষ।—আচ্ছা ওসব এখন বাদ দাও। তুমি একটু এপাশে সরে এসো।

# ব্যাণ্ড মাষ্টার

ছেলেটার বেশ মিষ্টি চেহারা। প্রথম দিন দেখেই আমার ভাল লেগেছিল। বড ট্রে-তে কাপ-ডিস তুলে একটা ময়লা কাপড় দিযে টেবিল পরিষ্কার করে চলে যেত। চলে যাবার সময হযত বা একবার চাইত আমার দিকে। এক মুহূর্ত, তার বেশী না। সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি গুটিযে নিযে জনতা কফি হাউসের মধ্যে হারিয়ে যেত। তারপর উর্দিপরা বেযারা আসত। অর্ডার দিলে কফি এনে দিত। কফি খাওয়া শেষ হবার পরও আমি আর মৃদুলা বসে বসে গল্প করতাম। ওরই এক ফাঁকে বেযারা এসে পযসা নিযে যেত। দশ-বিশ পযসা টিপস দিতাম। কোনদিন জাপানী পুতুলের মত হাতটা একটু তুলতো, কোনদিন তুলতো না। চলে যেতো। আমি আর মৃদুলা তখনও গল্প করতাম। উঠতাম না। আবার ঐ ছেলেটা আসত। ট্রে-তে কাপ-ডিস তুলতো, টেবিল সাফ করে দিত। একটু সলজ্জ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইত, হযত বা মৃদুলার দিকেও। আমি ওকে একটু ভাল করে দেখার আগেই ও জনতা কফি হাউসের জনারণ্যে হারিযে যেত।

এসব বেশ অনেক কাল আগেকার কথা। মুসৌরীতে বেড়াতে গিযে মৃদুলার সঙ্গে আলাপ হযেছে। দিল্লীতে এসে ভাব হযেছে। রোজ কফি হাউসে যাই, কনট প্লেসে ঘুরে বেডাই। পাশাপাশি বসে সিনেমা-থিয়েটার দেখি। একটু হাত চেপে ধরি, একটু অহেতুক হাসি। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এলে দুজনে দুদিকে চলে যাই। রাত্রির অন্ধকারেও কেমন যেন একটা সোনালী সকালের নেশায় বিভোর থাকি।

তারপর আস্তে আস্তে কফি হাউসে যাওয়া বন্ধ করলাম। অত ভীড়ের মধ্যে কথা বলে মৃদুলার মন ঠিক ভরত না। একটু নিবিড় হবার জন্য মৃদুলা নিয়ে যেতো ইণ্ডিয়া গেটের আশ-পাশের গাছতলায়, বুদ্ধ জয়ন্তী পার্কে অথবা অন্য কোথাও। কফি হাউসের ঐ মিষ্টি চেহারার ছেলেটার সঙ্গে আর দেখা হতো না, কিন্তু মাঝে মাঝেই আমার মনে পড়তো। মনে পড়তো ওর সলজ্জ মিষ্টি দৃষ্টির কথা।

আমার আর মৃদুলার দিনগুলো বেশ কাটছিল। আনন্দে, খুশীতে।

বিভোর হয়ে গেলাম নিজেদের স্বপ্নে। আস্তে আস্তে ভুলে গেলাম ঐ সুন্দর মিষ্টি চেহারার ছেলেটাকে। কফি হাউসের সামনে দিয়ে যাবার সময়ও মনে পড়ত না ওর সলজ্জ দৃষ্টির কথা।

বছর খানেক পার হয়ে গেল।

সুরেশ তানিজার বিয়েতে গেছি আমরা দুজনেই। বিরাট আয়োজন। প্যাণ্ডেলের গেটের কাছে বেশ ভীড়। একটু দূরেই ব্যাণ্ড পার্টি। মাঝে মাঝে হিন্দী ফিল্মের গান বাজাচ্ছে। আমি আর মৃদুলা একটু দূরে দাড়িয়ে কথা বলছি। নিজেদের কথা। নানা কথা। কবে এই রকম প্যাণ্ডেলের সামনে আমরা দুজনে দাঁড়িয়ে দাড়িয়ে অতিথিদের অভ্যর্থনা করব, কবে আমরা দুজনে··

'সেলাম সাব!' ব্যাণ্ড পার্টির একটা লোক এসে হঠাৎ আমাদের পাশে দাড়িয়ে সেলাম জানাতেই চমকে উঠলাম।

আমি আর মৃদুলা অবাক হয়ে ওর দিকে চাইলাম।

'চিনতে পারছেন স্যার?'

আমি আর মৃদুলা একসঙ্গেই বললাম, নাতো।

মাথার লাল রং-এর টুপিটা খুলে বললো, আমি কফি হাউসে ···

এবার মনে পড়ল। কাপ-ডিস তুলে নিত, টেবিল সাফ করত, আর মুহূর্তের জন্য একবার আমাকে আর মৃদুলাকে দেখত

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। এখন তুমি ব্যাণ্ড পার্টিতে জয়েন করেছ?'

'হ্যাঁ সাব। বহুদিনের ইচ্ছা ছিল··'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ।'

আরো দু'চারটে কথাবার্তার পর ও একবার মৃদুলার দিকে তাকিয়েই দৃষ্টিটা নামিয়ে নিল। খুব চাপা গলায় বললো, আগে জানলে আপনাদের সাদির সময় আমাদের ব্যাণ্ড পার্টি নিয়ে যেতাম।

কনুই দিয়ে মৃদুলাকে একটু গুঁতো দিয়ে আমি হাসতে হাসতে বললাম, আমাদের এখনও বিয়ে হয়নি।

ও আমার কথা ঠিক বিশ্বাস করতে পারল না। মৃদুলাকে জিজ্ঞাসা করল, বাবুজি ঝুট বলছেন, তাই না বিবিজি?

মৃদুলাও হাসল। 'বাবুজি ঝুট বলবেন কেন? সত্যি কথাই বলছেন।'

ছেলেটা যেন একটু নিশ্চিন্ত হলো। দৌড়ে গিয়ে ব্যাণ্ড মাষ্টারের কাছ থেকে একটা কার্ড এনে আমার হাতে দিয়ে বললো, সাদির ডেট ঠিক হলেই একটা খবর দেবেন।

মৃদুলাকে বিয়ে করার সময় অনেক কিছু করার পরিকল্পনা ছিল মনের মধ্যে। কিন্তু ব্যাণ্ড পার্টি আনার কোন ইচ্ছা ছিল না। তবু তাকে তা বলতে পারলাম না। কার্ডটা নিয়ে বললাম, আচ্ছা।

একটা কার্ডে ও আমার ঠিকানাটাও লিখে নিল।

তারপর আবার সেলাম করল আমাদের। 'গরীব জয়দীপকে ভুলবেন না।'

জয়দীপ কদাচিৎ কখনও আমার বাসায় আসত। বসতো। গল্প করত 'সাব, আপনি তো আর্টিষ্ট। আমার একটা কাজ করে দেবেন?'

'কি কাজ?'

মুখ নীচু করে জবাব দিল, আমার সাদীর সময় সুন্দর কার্ড তৈরি করে দেবেন?

'দেব।'

জয়দীপ খুব খুশী। ঐ সামান্য প্রতিশ্রুতির জন্য ও আমার আরো ভক্ত হয়ে উঠল।

ফিরোজপুর জেলার একটা ছোট্ট গ্রামে জয়দীপের বাড়ি। পাশের গ্রামের এক ব্যাণ্ড মাষ্টারের মেয়েকে ভালবাসে। দারুণ ভালবাসে। বিয়ে করবেই। জয়দীপের মা বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিলেন ঐ ব্যাণ্ড মাষ্টারের কাছে। রাজী হয়নি ব্যাণ্ড মাষ্টার। বলেছে, ক্ষেত খামারি করা ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবে না; বিয়ে দেবে বড় শহরের কোন ব্যাণ্ড মাষ্টারের সঙ্গে।

বড় শহরের ব্যাণ্ড মাষ্টার! ফিরোজপুর, অমৃতসর, আম্বালা, লুধিয়ানার ব্যাণ্ড মাষ্টারের সঙ্গে বিয়ে দেবে?

জয়দীপ চলে এসেছে দিল্লী। ফিরোজপুর, অমৃতসর, আম্বালা, লুধিয়ানা জলন্ধরকে পিছনে ফেলে এসেছে দিল্লী। সারা হিন্দুস্থানের রাজধানী! প্রথমেই ব্যাণ্ড পার্টিতে চান্স পায়নি। কুচ পরোয়া নেই! কফি হাউসে নোংরা কাপ-ডিস তুলেছে, টেবিল সাফ করেছে। তারপর চান্স পেয়েছে ব্যাণ্ড পার্টিতে। রাষ্ট্রপতি ভবনের সৈন্যদের মত সোনালী-রূপালী জরির লাল পোষাক পরে জয়দীপ ব্যাণ্ড পার্টিতে বাজনা বাজায়। আরো কিছুকাল বাজাবে।

তারপর নিজের ব্যাণ্ড পার্টি তৈরী করবে। ব্যাণ্ড মাষ্টার হবে। উঁচু প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে ক্লারিওনেট বাজাবে। ওর ক্লারিওনেটের সুরে বেজে উঠবে আর সব বাজনা। বিয়ে বাড়ির সবাই মুগ্ধ হয়ে শুনবে সেই বাজনা আর চেয়ে দেখবে ব্যাণ্ড মাষ্টারকে। জয়দীপকে।

তারপর মাকে আরেকবার পাঠাবে পাশের গ্রামে।

আমি ঘরের মধ্যে ছবি আঁকতাম আর জয়দীপের কথা শুনতাম।

'জানেন সাব, যেদিন লালকেল্লার সামনে লাজপত মার্কেটে 'জয়দীপ ব্যাণ্ড'-এর সাইন বোর্ড ঝুলবে, তারপর দিন মাকে পাঠাব।'

আমি হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করতাম, তোমার বিয়েতে আমাদের নেমতন্ন করবে তো?'

'সত্যি যাবেন বাবুজি?'

'যাব না কেন?'

'বিবিজিকেও নিয়ে যাবেন তো?'

'গেলে দুজনেই যাব।'

'আপনারা গেলে তো গ্রামের লোক চমকে যাবে।'

'কেন?'

'কেন আবার! আমাদের মত সাধারণ গরীবের বিয়েতে কি আপনাদের মত লেখাপড়া জানা লোক যায়?'

অনেক কাল পরে দিল্লী এসেছি এশিয়া-৭২এর জন্য। সারাদিন কাজ করে ক্লান্ত হই। চলে আসি কনট প্লেসের কফি হাউসে। রোজ। চুপচাপ বসে বসে কফি খেতে খেতে মনে পড়ে পুরোনো দিনের কথা।

'সাব! আপনি বাঙালীবাবু আর্টিষ্ট আছেন?' কফির কাপটা আমার সামনে নামিয়ে রাখতে রাখতে জিজ্ঞাসা করল।

একটু অবাক হলাম। 'হ্যাঁ।'

'বহুকাল আর আপনাকে দেখি না তো?'

'আমি আর এখানে থাকি না।

'কোথায় থাকেন?'

'কলকাতায়।'

কনট প্লেসের কফি হাউসে নিত্য প্রতিনিয়ত কত হাজার হাজার লোক

আসে। তবু এ বেয়ারাটা যে আমাকে চিনতে পেরেছে, তারজন্য সত্যি আশ্চর্য হলাম।

'আমাকে আপনি চিনতে পারেন নি, তাই না?' একটু শুকনো হেসে বেয়ারাটা প্রশ্ন করল।

চিনতে পারিনি ঠিকই কিন্তু মুখে বললাম, এবার মনে পড়েছে।

বেযারাটা এবার সোজাসুজি বললো, বাবুজী আমি জয়দীপ!

জয়দীপ! ব্যাণ্ড পার্টির জয়দীপ! ব্যাণ্ড মাষ্টার হবার স্বপ্ন দেখত যে সে কফি হাউসের বেয়ারা হয়েছে?

'তোমার ব্যাণ্ড পার্টি…

কথাটা শেষ করতে হলো না। জয়দীপ বললো, গরীব মানুষের কপালই খারাপ হয় বাবুজী।'

আমি অবাক হয়ে জয়দীপের মুখের দিকে তাকিয়ে আছি।

'বাবুজী, বিবিজিকে নিয়ে এসেছেন?'

বিবিজি? মৃদুলা?

তাড়াতাড়ি একটা কাগজে আমার হোটেলের ঠিকানা লিখে ওর হাতে দিয়ে বললাম, একটু রাত করে এসো। কথা হবে।

জয়দীপ এসেছিল। বলেছিল সব কথা। দুঃখের কথা, হতাশার কথা, ব্যর্থতার কথা।……লাজপত নগরের এক বিয়ে বাড়ির রিসেপশনে বাজাতে গিয়েছিল জয়দীপের ব্যাণ্ড পার্টি। প্যাণ্ডেলের বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাজাচ্ছিল খুব সুন্দর একটা গান। হঠাৎ পাশ দিয়ে গ্রামের কুলদীপ সিংকে যেতে দেখে জয়দীপ ছুটে গেল। না গিয়ে পারল ন'…

জয়দীপের চোখে জল। গলার স্বরটাও কেমন পালটে গেছে। 'জানেন বাবুজী, যাকে বিয়ে করব ভেবেছিলাম, সে ঐ বাড়িতেই বৌ হয়ে এসেছিল।

জয়দীপের কথা শুনে আমি যেন ইলেকট্রিক শক্ খেলাম। 'বল কি?'

'হ্যাঁ বাবুজি! আপনাকে কি মিথ্যে কথা বলব?'

অনেকক্ষণ দুজনে চুপ করে বসে রইলাম। তারপর জয়দীপ জিজ্ঞাসা করল, বিবিজী ভাল আছেন তো!

আমারও চোখের কোণায় এক বিন্দু জল এসে গেল। 'খুব বড় এক সাহেবের সঙ্গে বিয়ে হবার পর ও বিলেত চলে গেছে।'

জয়দীপ প্রায় চীৎকার করে উঠল, 'বলেন কি বাবুজি ?'

অনেক কষ্টে আমি মুখে একটু হাসি ফুটিযে বললাম, 'জয়দীপ, আমিও ব্যাণ্ড মাষ্টার হতে পারলাম না।'

পরের দিন কফি হাউসে গেলাম। জয়দীপ কফি দিল, কিন্তু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরেও পয়সা নিতে এলো না। অনেক খুঁজলাম, কিন্তু অত ভীড়ের মধ্যে কিছুতেই ওকে খুঁজে পেলাম না। কাউন্টারে পযসা দিয়ে আমি কফি হাউস থেকে বেরিয়ে কনট প্লেসের ভীড়ে হারিযে গেলাম।

## চিত্রাঙ্গদা

সারা শিলিগুড়ি শহরে হৈ চৈ পড়ে গেছে। হিলকার্ট রোড, বর্ধমান রোড, সেবক রোড, সুভাষ পল্লী, মেন রোড আর বিধান রোড বড বড় পোষ্টারে ছেয়ে গেছে। পুরনো শিলিগুড়ির বাবু পাড়া, মহানন্দা রোড, দেশবন্ধু পাড়া, মিলন পল্লী থেকে নতুন শিলিগুড়ির হাকিম পাড়া, আশ্রম পাড়া, সুভাষ পল্লীর প্রত্যেক অলিতে-গলিতে রাস্তার কোণায় কোণায় পোষ্টার। পোষ্টার লাগানো হয়েছে পুরানো বাজার, বিধান মার্কেট আর হিলকার্ট রোডের সব বড় দোকানে। সেবক রোডের মোড়ে কালিম্পং গ্যাংটকের বাস স্ট্যাণ্ডে, বিধান মার্কেটের ধারে ডুয়ার্সের বাস আড্ডায়, মহানন্দা ব্রীজের কাছে ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট আর প্রাইভেট বাস ষ্ট্যাণ্ডে ডজন ডজন লাগানো হয়েছে। পোষ্টার চলে গেছে বালুরঘাট, রায়গঞ্জ, মালদা, কুচবিহার, দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্শিয়াং, ডুয়াসে'র মালবাজার, মেটেলী, নাগরাকাটা, ময়নাগুড়ি, ধুপগুড়ি, গায়রকাটা, বীরপাড়া, মাদারিহাট, আলিপুরদুয়ার, হ্যামিলটনগঞ্জের হাটে-বাজারেও পোষ্টার ছেয়ে গেছে। শিলিগুড়ি আর নিউ জলপাইগুড়ি দিয়ে যে সব ট্রেন যাতায়াত করে, তাদের গায়েও পোষ্টার লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। রেলওয়ে ডিজেল কলোনী বা নিউ জলপাইগুডি রেল কলোনীতেও বাদ পড়েনি। বাদ পড়েনি নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস বা মেডিক্যাল কলেজ।

প্রচার সম্পাদক এতেই খুশী নন। অটো রিক্সায় লাউড স্পীকার লাগিয়ে শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি শহরে প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যেয় কয়েক ঘণ্টা প্রচার বিভাগের স্বেচ্ছাসেবকরা শিলিগুড়ি শিল্পী তীর্থের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবের সপ্তাহ-ব্যাপী অনুষ্ঠান সূচীর বিস্তৃত বিবরণ প্রচার করছেন।

সারা উত্তর বাংলায় এত বড় সাংস্কৃতিক উৎসব এর আগে হয়নি। এক্সি-কিউটিভ কমিটির সভায় প্রথম তরু রায় বলেছিলেন, শিলিগুড়ি ছোট শহর হলেও শিল্পী তীর্থের এক ইতিহাস আছে, ঐতিহ্য আছে। স্বয়ং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম বার্ষিক উৎসবে সভাপতিত্ব করেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের পাদস্পর্শে ধন্য এই প্রতিষ্ঠানে কাজী নজরুল ইসলাম, [illegible]রনাথ [illegible]ন্দোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত, তারাশঙ্কর থেকে শুরু করে

বাংলার সমস্ত খ্যাতিমান সাহিত্যিক···

ওকে বাধা দিয়ে বৃদ্ধ অমূল্যবাবু বললেন, ভুলে যেও না একবার শরৎচন্দ্র পর্যন্ত আমাদের গান শুনতে এসেছিলেন।

তরুবাবু হেসে বললেন, দাদা, সে স্মৃতি কী কোনদিন ভুলতে পারব।

অমূল্যবাবু প্রশ্ন করলেন, উনি প্রথমেই কোন্ গানটা শুনতে চেয়েছিলেন, মনে আছে?

তরুবাবু হাসতে হাসতে বললেন, হে মোর চিত্ত পুণ্যতীর্থে জাগো রেধীরে।

অমূল্যবাবু স্কুলে ইংরাজী পড়াতেন। রিটায়ার করার বিশ পঁচিশ বছর পরেও পুরানো অভ্যাস ছাড়তে পারেন নি। খুশীর হাসি হেসে বললেন, ইউ আর রাইট।

সত্যি শিলিগুড়ি শিল্পীতীর্থের একটা ইতিহাস ও ঐতিহ্য আছে। কলকাতার বাইরে বোধহয় একমাত্র শিল্পীতীর্থেই পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ আব বড়ে গোলাম আলি খাঁ সাহেব গান গেয়েছেন। আগে প্রত্যেকবার বার্ষিক উৎসবে পঙ্কজ মল্লিক আসতেন। আজকাল বয়স হয়েছে, শরীরও ভাল না। আর আসেন না। আসতে পারেন না। তবু শিল্পীতীর্থের চিঠি গেলেই একটা সুন্দর জবাব লিখবেনই।

তখন নিউ থিয়েটার্সে'র স্বর্ণযুগ। পঙ্কজ মল্লিক আর সায়গল তখন প্রত্যেক বাঙালীর হৃদয়ে মুকুটহীন সম্রাট হয়ে বসে আছেন। সেবার শিল্পীতীর্থের বার্ষিক উৎসবে বাংলার সঙ্গীত জগতের এই দুটি ধ্রুবতারা এলেন। বাপরে বাপ। সে কী কাণ্ড। বোধহয় সারা ডুয়ার্সে'র মানুষ এসে ভেঙ্গে পড়েছিল শিলিগুড়ি শহরে। ভোরবেলায় দার্জিলিং মেল এলো। কিন্তু সেই সাত সকালেই ষ্টেশনে যে এত ভীড় হবে, তা কেউ কল্পনা করতে পারেননি। ঘণ্টাখানেক চেষ্টা করেও শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা আর পুলিশ এই দুই যশস্বী শিল্পীকে ট্রেন থেকে বের করার ব্যবস্থা করতে পারলেন না। দার্জিলিং এর ডেপুটি কমিশনার ল্যাম্বার্ট সাহেবও ঐ ট্রেনেই কলকাতা থেকে এসেছিলেন। বিখ্যাত আই, সি, এস অফিসার। তিনিও অনেক আবেদন নিবেদন করলেন, কিন্তু জনতা কর্ণপাত করল না।

তখন পঙ্কজ মল্লিক বললেন, তরু, লাউড স্পীকার আনাবার ব্যবস্থা করো। আমরা দুজনে দুটো গান শোনালেই বোধহয় ক্রাউড আমাদের রাস্তা ছেড়ে দেবে।

কিছুক্ষণের মধ্যে লাউড স্পীকার আনান হলো। ট্রেনের দরজার কাছে এসে পঙ্কজ মল্লিক মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে বললেন, আপনারা আমার ও সায়গল সাহেবের প্রণাম গ্রহণ করুন।

সঙ্গে সঙ্গে সমবেত জনতার হাততালিতে যেন হিমালয় পর্যন্ত কেঁপে উঠল।

আমি দেশ মাতৃকার একটা বন্দনা সঙ্গীত গাইব। তারপর সায়গল সাহেব আপনাদের একটি অতি প্রিয় গান শোনাবেন।

আবার সেই হাততালি।

কিন্তু তারপর অনুগ্রহ করে আপনারা আমাদের ট্রেন থেকে নামার ব্যবস্থা করবেন।

হারমোনিয়ম নেই, তবলা নেই। মাইক্রোফোন হাতে নিয়েই পঙ্কজ মল্লিক শুরু করলেন 'অয়ি ভুবন মন মোহিনী।'

পঙ্কজ মল্লিকের গান শেষ হতেই তার হাত থেকে মাইক্রোফোন নিয়ে সায়গল শুরু করলেন, 'একটুকু ছোঁয়া লাগে, একটুকু কথা শুনি—'

হাততালি থামার পর বিশাল জনতা মন্ত্রমুগ্ধের মত দুই শিল্পীর জন্য পথ করে দিলেন। দেখেশুনে আই, সি, এস ল্যাম্বার্ট সাহেবের চক্ষুস্থির। বললেন, আই ফাইণ্ড দে আর পপুলার লাইক কিংগস্।

শিল্পীতীর্থের পঞ্চাশ বছরের জীবন কাহিনীর পাতায় পাতায় এইরকম কাহিনীতে ভরা। তরুবাবু বললেন, আমাদের এই শিল্পীতীর্থের গোল্ডেন জুবিলী উৎসব সাধারণ ভাবে করার প্রশ্নই ওঠে না। অন্ততপক্ষে সপ্তাহব্যাপী উৎসব করতেই হবে এবং বাংলার সমস্ত মনীষী ও যশস্বী শিল্পীদের আনতেই হবে।

হাজার হোক বাঙালী প্রতিষ্ঠান। চট করে কোন সিদ্ধান্ত হয় না। পর পর অনেকগুলো মিটিং-এ বহু আলাপ আলোচনা তর্ক-বিতর্ক হবার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, সপ্তাহব্যাপী এমন উৎসব করতে হবে যে সারা উত্তর বাংলায় আলোড়ন সৃষ্টি করে।

শিল্পীতীর্থের এই সিদ্ধান্তের কথা ছড়িয়ে পড়তে সময় লাগল না। মহাকালী সুইটস্, জলযোগ আর মায়া কেবিনের আড্ডাখানায় অনেকেই বললেন, যত গর্জায় তত বর্ষায় না। শেষ পর্যন্ত বিনোদের পরিচালনায় 'সাজাহান' নাটক আর তরুদার গানের সঙ্গে পেট মোটা শেফালী ঘোষের নৃত্য ছাড়া আর কিছু হবে না। কেষ্ট কুণ্ডু বললো, আর একটা প্রোগ্রাম হবে।

কোনটা ?

শিলিগুড়ি ষ্টেশনের চিঠি কালেক্টর প্রফেসার এ. কে ঘোষের ম্যাজিক।

কেষ্ট কুণ্ডুর কথায় সবাই হো হো করে হাসেন।

বেশীদিন নয়, মাস খানেকের মধ্যেই আলোচনার মোড় ঘুরে গেল। একেবারে এ্যাবাউট টার্ণ। দিল্লী থেকে চিঠিখানা আসার একদিনের মধ্যেই আগুনের মতো খবরটা ছড়িয়ে পড়ল, উপরাষ্ট্রপতি ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ শিল্পীতীর্থের গোল্ডেন জুবিলী ফাংশনের উদ্বোধন করবেন।

পরদিন এস. ডি. ও সাহেব হঠাৎ শিল্পীতীর্থের অফিসে হাজির হয়ে বললেন, কাল দার্জিলিং থেকে ডি, সি আসছেন। আপনাদের গোল্ডেন জুবিলীর ব্যাপারে উনি আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে চান।

পরের দিন সন্ধ্যে সাতটায় পি, ডবলিউ, ডি ইন্সপেকশন বাংলোর কনফারেন্স রুমে সভার শুরুতেই ডেপুটি কমিশনার সাহেব বললেন, ভাইস প্রেসিডেণ্ট যখন আসছেন, তখন আপনাদের প্রোগ্রামও ডিটেল্‌স জানা দরকার।

শিল্পীতীর্থের সভাপতি জানালেন, সব প্রোগ্রাম এখনও ফাইনালাইজ হয়নি, তবে ডক্টর রাধাকৃষ্ণণ ছাড়া ডক্টর সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, উমাশঙ্কর যোশী, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপ্যাধায়, উৎপল দত্ত, শম্ভু মিত্র, কানন দেবী, উত্তমকুমার···

ডেপুটি কমিশনার চমকে উঠলেন, উত্তমকুমারও আসবেন ?

হ্যাঁ।

ডি-সি সাহেব হাসতে হাসতে বললেন, তাহলে তো আমাকে দু'এক ব্যাটেলিয়ান সি-আর-পি'র ব্যবস্থা করতে হবে।

সভাপতি বলে যান, এছাড়া সমস্ত নামকরা গায়ক-গায়িকারাই আসবেন।

সমস্ত মানে ?

যুথিকা রায়, সুচিত্রা মিত্র, কণিকা, হেমন্ত, দ্বিজেন, মানব, শ্যামল মিত্র, নির্মলেন্দু চৌধুরী, সতীনাথ, উৎপলা, সুপ্রভা সরকার, ভূপেন হাজারিকা, সন্ধ্যা মুখার্জী, রাজেশ্বরী দত্ত, ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়···

সভাপতি সব নাম বলার আগেই ডি সি বলেন, কিন্তু এরা সবাই কি সত্যি আসবেন ?

তরুবাবু সঙ্গে সঙ্গে ডি, সি সাহেবের সামনে একটা ফাইল দিয়ে বললেন, এর মধ্যে সবার কনসেণ্ট লেটার আছে।

ডি, সি সাহেব অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে প্রত্যেকটা চিঠি পড়তে পড়তে মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করলেন, অশেষ মিত্র ও চিত্রা সরকার কি আমাদের ক্লাবেই প্রথম গান শেখে ?

সভাপতি সাহেব হাসতে হাসতে বললেন, ওরা দুজনেই আমাদের এই তরু রায়কতের ছাত্র।

তাই নাকি ?

তরুবাবু একটু আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে বললেন, শেষের দিন ওদের মত পুরোনো ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে চিত্রাঙ্গদা করাবো ঠিক করেছি।

ডি-সি সাহেব বললেন, বোধহয় দশ বারো বছর আগে মহাজাতি সদনে আমি ওদের চিত্রাঙ্গদা দেখেছিলাম। সত্যি অপূর্ব, কোন তুলনা হয় না।:

শিল্পীতীর্থের এক্সিকিউটিভ কমিটি মূল দায়িত্ব বহন করলেও জলপাইগুড়ির ডিভিশন্যাল কমিশনারকে সভাপতি করে একশ জনের অভ্যর্থনা সমিতি গঠন করা হল। কয়েকজন সাব-কমিটিও তৈরী হল। চা বাগানের মালিক, কণ্ট্রাক্টর, ব্যাবসাদাররা হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। দিন পনেরর মধ্যেই অভ্যর্থনা সমিতির এক হাজার সদস্য হয়ে গেল।

মায়া কেবিনের চপ-কাটলেট বিক্রী বেড়ে গেল। মহাকালী সুইটস্, জলযোগ আর এয়ারভিউ রেষ্টুরেন্টেও ঐ একই আলোচনা। শিল্পীতীর্থের গোল্ডেন জুবিলী। শিলিগুড়ি কলেজের ছেলেমেয়েদেরও আর কোন বিষয়ে আলোচনার নেই। আলোচনা সর্বত্র। স্কুল-কলেজে, অফিসে-আদালতে, পাড়ার ক্লাবে, প্রত্যেক বাড়ির বাইরের ঘরে পাড়ার গিন্নীদের আড্ডায়। ট্রেনের যাত্রী, বাসের প্যাসেঞ্জাররাও একথা সেকথার পর ঐ আলোচনাই শুরু করেন।

তরুবাবুর চিঠি পেয়েই অশেষ মিত্র লিখলেন, শিল্পীতীর্থের এমন ঐতিহাসিক দিনে উপস্থিত থেকে চিত্রাঙ্গদার অংশ গ্রহণ করতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করব। কিন্তু চিত্রা কি আসবে ? লখনৌ মরীস কলেজের প্রফেসর হবার পর ও বছরে একবার রেকর্ড করতে আসে, কিন্তু আমার সঙ্গে দেখা হয় না। চিত্রা এলে রিহার্স্যাল দেবার দরকার হবে না, তবে অন্য কেউ হলে দু'চারদিন তো লাগবেই।

চিত্রা শিলিগুড়ি ছেড়ে কলকাতা গিয়েছিল। মহাজাতি সদনে পর পর কয়েকটা অনুষ্ঠানে গান গাইবার পরই কলম্বিয়া রেকর্ড বার করল। চাঞ্চল্য

পড়ে গেল চারিদিকে। রেডিও আর ফিল্ম থেকে টানাটানি শুরু করে দিল। খবরের কাগজে ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপনে চিত্রা সরকারের নাম ছাপা হলেই মহাজাতি সদন উপচে পড়ে। তারপর কি যেন হল। চিত্রা সরকার হঠাৎ একদিন পাঞ্জাব মেলে চড়ে লখনৌ চলে গেলেন।

অশেষের চিঠি আসার দশ-বারো দিন পরে লখনৌ থেকে চিত্রা সরকারের চিঠি এল। কালচারাল এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামে এক মাসের জন্য পূর্ব্ব ইউরোপ সফর করে গতকাল ফিরে এসেই আপনার চিঠি পেলাম। আপনার কাছেই আমার সঙ্গীত সাধনা প্রথম সুরু হয়। সুতরাং আপনার আদেশ অমান্য করার স্পর্দ্ধা আমার নেই। আসব। নিশ্চয়ই আসব। চিত্রাঙ্গদার গান গাইব। অশেষ মিত্র এখন কলকাতার যশস্বী শিল্পী। আমি চিত্রাঙ্গদার গান গাইলে তার পছন্দ হবে কি?

আর বেশী দিন বাকি নেই। তিলক ময়দান ঘেরা হয়ে গেছে। পি, ডবলিউ, ডি'র দু'তিন জন ইঞ্জিনীয়ার মঞ্চ নির্মানের তদারকী করছেন। মহানন্দার ব্রীজের সামনেই হিলকার্ট রোডের উপর বিরাট তোরণ তৈরীর কাজ প্রায় শেষ। ওদিকে পাঁচ হাজার সিজন টিকিট বিক্রী হয়ে গেছে।

আর মাত্র এক সপ্তাহ বাকি। তিলক ময়দানের পাশে জেলা পরিষদের ইন্সপেকশন বাংলোয় অভ্যর্থনা সমিতির অফিস উঠে গেল। দার্জিলিং এর ডেপুটি কমিশনার শিলিগুড়ি চলে এলেন। জলপাইগুড়ি থেকে ডিভিশন্যাল কমিশনার আর ডি, আই, জি রোজ দুপুরের পর এখানে আসছেন। ভি, আই পি ও শিল্পীদের আনা-নেওয়া, থাকা-খাওয়ার বিধি ব্যবস্থা খুঁটিনাটি পরীক্ষা করে দেখলেন। ভি, আই, পি ও শিল্পীরা কে কখন ট্রেনে-প্লেনে আসবেন বা যাবেন, কোথায় থাকবেন বাইরের কাউকে জানতে দেওয়া হল না। কয়েকজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী আর শিল্পীতীর্থের বিশিষ্ট কর্মকর্তারা ছাড়া আর কেউ সে খবর জানলেন না।

অবশেষে সেই পরম দিনটি সত্য সত্যই এসে গেল।

বাগডোগরার এয়ার পোর্টের আকাশে ছোট্ট চিলের মত বিমানটি দেখা দিতেই ডিভিশন্যাল কমিশনার ডি-আই-জিকে ইসারা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সবাই সতর্ক। শিলিগুড়ি কলেজের এন, সি, সির ছেলেমেয়েরা এ্যাটেনশন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিমান রানওয়ে স্পর্শ করল। ডিভিশন্যাল কমিশনার ডি, আই, জি, ডি, সি, শিল্পীতীর্থের সভাপতি হাতে মালা নিয়ে এগিয়ে এলেন।

বিমানটি সামনে এসে থামল। সহাস্য মুখে বেরিয়ে এলেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়। তাঁর পিছন পিছন পঙ্কজ কুমার মল্লিক, কানন দেবী, শম্ভু মিত্র, সুচিত্রা মিত্র, কণিকা ব্যানার্জী, দ্বিজেন মুখার্জী আর মানবেন্দ্র মুখার্জী নেমে এলেন। তারপর নামলেন ফিল্ম ডিভিশনের ক্যামেরাম্যান ও অল ইণ্ডিয়া রেডিও'র লোকজন। মুহূর্তের মধ্যে শিল্পীদের নিয়ে গাড়িগুলো বাগডোগরা এয়ার পোর্ট থেকে উধাও হয়ে গেল।

আকাশে আবার একটা ছোট্ট চিল দেখা দিল। ক'মিনিটের মধ্যেই ভারতীয় বিমান বাহিনীর বিশেষ বিমানটি বিদ্যুৎবেগে লম্বা রানওয়ে পার হয়ে সামনে এসে দাঁড়াল। একজন এয়ারম্যান বিমানের দরজা খুলে দিতেই দার্শনিক উপরাষ্ট্রপতি ডক্টর রাধাকৃষ্ণণ নেমে এলেন। সবার আগে ডাঃ রায়, তারপর অন্যান্যরা করমর্দন, নমস্কার, স্যালুট করলেন। এন, সি, সির ছেলেমেয়েদের গার্ড অফ অনার নিলেন। তারপর বিধানচন্দ্রের সঙ্গে গাড়িতে রওনা হলেন।

শিল্পীতীর্থের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব শুরু হল।

* * *

চিত্রাকে ঘরে ঢুকতে দেখেই অশেষ জিজ্ঞাসা করল, কেমন আছ চিত্রা?

ভাল। তুমি?

মোটামুটি।

মোটামুটি কেন? এত খ্যাতি, যশ, অর্থ। তবুও মোটামুটি?

অশেষ একটু হাসল।

ঘরের সবাই মুগ্ধ দৃষ্টিতে চিত্রার দিকে তাকিয়ে আছে। চিত্রা আস্তে আস্তে এগিয়ে ঘরের কোণায় পৌঁছে তরুবাবুকে প্রণাম করল। তরুবাবু ওর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করে ঘরের অন্যান্য ছেলেমেয়েদের বললেন, চিত্রা আমার ছাত্রী নয়, চিত্রা আমার সাধনা।

তরুবাবু একটু উদাস দৃষ্টিতে বাইরের আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, রাস্তাঘাটে পূজা প্যাণ্ডেলে, নানা বন্ধু বান্ধব পরিচিতদের বাড়িতে অশেষ আর চিত্রার গান শুনলেই আনন্দে আমার চোখে জল আসে। কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারি না। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ি, দূরে সরে যাই, আপন মনে চোখের জল ফেলি আর পুরানো দিনের কথা ভাবি।

প্রাণপ্রিয় দু'টি ছাত্রছাত্রীকে কাছে পেলে তরুবাবু একটু বেসামাল হয়ে পড়েন। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললেন, বহু স্কুল-কলেজ ক্লাবের বিভিন্ন

উৎসবে চিত্রাঙ্গদা হলে ষ্টেজের উপর ছেলেমেয়েরা নাচে, অভিনয় করে আর পর্দার অন্তরালে অশেষ চিত্রার চিত্রাঙ্গদার রেকর্ড চালায়। তখন আনন্দে, উত্তেজনায় মনে হয় আমিই অর্জুন, আমিই চিত্রাঙ্গদা।

সারা ঘরের পরিবেশটা এমন বদলে গেছে যে কারুর মুখে একটা কথা নেই। অশেষ চুপ করে আছে। চিত্রা মুখ নীচু করে মনে মনে পুরোনো দিনের স্মৃতি রোমন্থন করছে।

হঠাৎ অশেষ বললো, তরুদা, চিত্রা নামটা কিন্তু আমারই দেওয়া।

ঘরের সবাই চমকে উঠল। চিত্রা একটু হাসল।

তরুবাবু একটু হেসে ঘরের ছেলেমেয়েদের বললেন, চিত্রার আসল নাম মালা। কিন্তু চিত্রাঙ্গদার গান গেয়ে ও এত জনপ্রিয়া হয়ে উঠল যে শিল্পীতীর্থের সবাই ওকে চিত্রাঙ্গদা বলেই ডাকত, আর লজ্জায় ওর সুন্দর মুখখানা আরও সুন্দর হয়ে উঠত।

এখনও কথাটা শুনে লজ্জায় চিত্রার সুন্দর মুখখানা আরও সুন্দর হয়ে উঠল। কোন মতে বললো, চুপ করুন তরুদা।

তরুদা হাসতে হাসতে বললেন, কাগজে ম্যাগাজিনে তোমার যে জীবনী ছাপা হয় তাতে তো এসব কথা লেখা হয় না, তাই এসব ·

ওকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই অশেষ বললো, তাই আমি ওর নাম দিলাম চিত্রা। এখন সারা দেশের মানুষ ওকে চিত্রা বলেই জানে।

এতবড় দুজন শিল্পীকে এত কাছে পেয়ে সবাই আনন্দে গর্ব্বে মুগ্ধ। স্তম্ভিত।

হঠাৎ তরুবাবু বললেন, চিত্রা, সব সময় তুমি এত দুঃখের গান রেকর্ড করো না যে শুনে আমার বড় কষ্ট হয়।

চিত্রা কোন জবাব দেয় না। মুখ নীচু করে বসে থাকে।

তোমার লেটেষ্ট রেকর্ডটা শুনে আমি চোখের জল আটকাতে পারিনি। একে ঐ গান, তার উপর তুমি এমন আশ্চর্য দরদ দিয়ে গেয়েছ যে···

চার পাঁচটি ছেলেমেয়ে এক সঙ্গে জানতে চাইল, কোন গানের কথা বলছেন তরুদা?

ওদের কথার জবাব না দিয়ে তরুবাবু চিত্রার দিকে হারমোনিয়ামটা এগিয়ে দিয়ে বললেন, লক্ষ্মী মা আমার, এদের গানটা শুনিয়ে দে।

চিত্রা না বলতে পারল না। হারমোনিয়ামটা কাছে টেনে নিল।

আপন মনে কী যেন ভাবল কয়েক মিনিট। তারপর শুরু করল :

অনেক কথা বলেছিলেম কবে তোমার কানে কানে।
কত নিশীথ-অন্ধকারে কত গোপন গানে গানে ॥

তরুবাবুর চোখ বন্ধ। অশেষ একবার চিত্রার দিকে তাকিয়েই দৃষ্টি গুটিয়ে নিল। ঘর ভর্তি ছেলেমেয়েরা মুগ্ধ হয়ে শুনছে। বড়দা বিভোর হয়ে তবলা বাজাচ্ছেন।

চিত্রা আপন মনে গেয়ে যায়—

সেকি তোমার মনে আছে তাই শুধাতে এলেম কাছে।
রাতের বুকের মাঝে তারা মিলিয়ে আছে সকল খানে ॥

অশেষ আবার চিত্রার দিকে না তাকিয়ে পারে না। তরুবাবু বললেন—আহা হা।

চিত্রা থামে না। থামতে পারে না। গানে গানে বলে যায়—

ঘুম ভেঙ্গে তাই শুনি যবে দীপ-নেভা মোর বাতায়নে
স্বপ্নে-পাওয়া বাদল হাওয়া ছুটে আসে ক্ষণে-ক্ষণে—
বৃষ্টি ধারার ঝরো ঝরে ঝাউবাগানের মরো মরে
ভিজে মাটির গন্ধে হঠাৎ সেই কথা সব মনে আনে ॥

গান শেষ হতেই চিত্রা লুকিয়ে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল। দু পাঁচ মিনিট ঘরের কেউ কোন কথা বলতে পারলেন না। তারপর তরুবাবু বললেন, এসো আমরা একটু তালিম দিয়ে নিই।

শিল্পীতীর্থের ঐতিহাসিক স্বর্ণ-জয়ন্তী উৎসবের আজ শেষ দিন। তিলক ময়দান উপচে পড়ছে। ঠিক সাড়ে ছটায় রাজ্যপাল শ্রীমতি পদ্মজা নাইডু ও অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর এসে পৌঁছাতেই পর্দা সরে গেল। অন্ধকার মঞ্চ আলোয় ভরে গেল।

উদ্বোধন সঙ্গীত, সভানেত্রী ও প্রধান অতিথি বরণ, মাল্যদান, ভাষণ শেষ হল।

শ্রীমতি নাইডু আর অধ্যাপক কবীর মঞ্চ থেকে নেমে এসে দর্শকদের প্রথম সারিতে বসলেন।

আবার পর্দা সরে গেল। তিনটি মাইক্রোফোনের উপর তাপস সেন দুদিক থেকে দুটো স্পট ফেললেন। ধুতি পাঞ্জাবী আর গলায় চাদর দিয়ে সৌম্য-

দর্শন তরু রায়কত মাইক্রোফোনের সামনে এসে সবাইকে নমস্কার করতেই চারিদিক থেকে হাততালি পড়ল। হাততালি থামল।

তরুবাবু বললেন, আজ আমাদের ঐতিহাসিক স্বর্ণ-জয়ন্তী উৎসবের শেষ দিন। বিশ্ববন্দিত দার্শনিক ডক্টর থেকে সুরু করে সারা বাংলার সমস্ত গুণীজ্ঞানী ও মনীষীর সান্নিধ্যে আমরা ধন্য হয়েছি। তবে আজকের অনুষ্ঠানটি আমাদের কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। আমাদের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রছাত্রীরা 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ করছেন। আমাদের প্রাক্তন ছাত্র অশেষ মিত্র ও প্রাক্তন ছাত্রী চিত্রা সরকার আজ সারা বাংলার দুই অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পী এবং আপনারা শুনে সুখী হবেন যে শিল্পীতীর্থ প্রযোজিত চিত্রাঙ্গদার গান গেয়েই তারা প্রথম সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আজকের অনুষ্ঠানে এরাই চিত্রাঙ্গদা ও অর্জুনের গান গাইবেন।

মঞ্চের দুদিক থেকে ওরা দুজনে প্রবেশ করতেই অজস্র সহস্র মানুষের হাততালিতে সারা শিলিগুড়ি সহর যেন কেঁপে উঠল।

পর্দা পড়ল। আবার উঠল।

মঞ্চের শেষের দিকে আবছা আলোয় শিল্পীদের দেখা দিতেই শোনাগেল— মণিপুর রাজের ভক্তিতে তুষ্ট হয়ে শিব বর দিয়েছিলেন যে তার বংশে কেবল পুত্রই জন্মাবে। তৎসত্ত্বেও যখন রাজকুলে চিত্রাঙ্গদার জন্ম হল, তখন রাজা তাঁকে পুত্ররূপেই পালন করেন। রাজকন্যা অভ্যাস করলেন ধনুর্বিদ্যা, শিক্ষা করলেন যুদ্ধবিদ্যা, রাজদণ্ড নীতি।

অর্জুন দ্বাদশবর্ষব্যাপী ব্রহ্মচর্যব্রত গ্রহণ করে ভ্রমণ করতে এসেছেন মণিপুরে। তখন এই নাটকের আখ্যান আরম্ভ।

সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল—

মোহিনী মায়া এল,
এল যৌবন কুঞ্জবনে।
এল হৃদয়শিকারে,
এল গোপন পদসঞ্চারে,
এল স্বর্ণকিরণ বিজড়িত অন্ধকারে।

কোথা দিয়ে কেমন করে সময় কেটে গেল, কেউ টের পেলেন না।

চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য শেষ হল।

দু' এক মিনিট সমস্ত দর্শক বিমুগ্ধ মনে নিজের আসনে বসে রইলেন;

তারপর পরিপূর্ণ আলোয় উদ্ভাসিত মঞ্চে সমস্ত শিল্পীরা দাঁড়াতেই শুরু হল হাততালি।

মিনিট দশেক পরে হাততালি চলার পর শুরু হল চিৎকার, চিত্রাঙ্গদা, অশেষদা সোলো গান শোনান। হাজার হাজার মানুষের অনুরোধ, উপরোধ। আস্তে আস্তে মঞ্চে উঠে এলেন রাজ্যপাল শ্রীমতি পদ্মজা নাইডু। মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, এত মানুষের অনুরোধ এরা কখনই অগ্রাহ্য করবেন না। করতে পারেন না। ওরা নিশ্চয় আমাদের গান শোনাবেন।

হাততালি।

হাততালি থামলে শ্রীমতি নাইডু বললেন, প্রফেসার কবীরের চিৎকার করতে লজ্জা করল বলে উনি আমাকে দিয়ে ওদের গান গাইতে অনুরোধ করতে ...

আবার হাততালি।

এবার শ্রীমতি নাইডু একটু হেসে বললেন, ইফ আই মে ডিসক্লোজ এ সিক্রেট, আই উড লাইক টু টেল ইউ ছাট ইনস্‌পাইট অফ বিইং এ্যান ওল্ড লেডী, আই এ্যাম ইন লাভ উইথ অশেষ.........

সারা প্যাণ্ডেল হাসিতে ফেটে পড়ল।

প্লীজ ডোণ্ট লাফ বিকজ অফ মাই লাভ !

আবার হাসি।

শ্রীমতি নাইডু এবার একটু চিত্রার দিকে তাকিয়ে বললেন, আমার প্রতিদ্বন্দ্বিনী চিত্রাঙ্গদা নিশ্চয়ই হিংসায় জ্বলে.........

হাসির ঝড় বয়ে যায় চারিদিক থেকে।

তবে চিত্রাঙ্গদা রাগ করলেও চিত্রা সরকার জানে আমি তার একজন গুণমুগ্ধ ফ্যান। ও রেকর্ডিং করতে কলকাতায় এলে আমাকে গান না শুনিয়ে লখনৌ ফিরে যেতে পারে না।

অশেষ পর পর পাঁচখানা গান গাইবার পর বললো, বড্ড ক্লান্ত বোধ করছি। তাই আর একটি গান শুনিয়ে আপনাদের কাছে বিদায় নেব। এবার গাইল—

ভরা থাক স্মৃতিসুধায় বিদায়ের পাত্রখানি।
মিলনের উৎসবে তায় ফিরায়ে দিয়ো আনি।

চিত্রা পাশেই বসে ছিল। শুনল। তারপর অশেষের সামনে থেকে হারমোনিয়াম টেনে নিল। অশেষ উঠলো না। বোধহয় উঠতে পারল না। পাশেই বসে রইল। চিত্রা একের পর এক গেয়ে গেল। থামে না, থামতে পারে না। থামতে চায় না। তারপর গাইল—

আমার পরাণ যাহা চায়
তুমি তাই, তুমি তাই গো।
তোমার ছাড়া এ জগতে
মোর কেহ নাই, কিছু নাই গো।

গানটা শেষ হতেই চিত্রা কোনমতে নমস্কার করেই ষ্টেজ থেকে প্রায় ছিটকে বেরিয়ে গেল।

ইনস্পেকশন বাংলার ভীড় পাতলা হলে চিত্রা চৌকিদারকে ডেকে বললো, অশেষ বাবুকে বলো আমি একটু দেখা করতে চাই।

চৌকিদার গেল না। ঐখানেই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

কি হল? যাও।

চৌকিদার তবুও দাঁড়িয়ে রইল।

কি আশ্চর্য! যাও অশেষবাবুকে খবর দাও।

অনেক কষ্টে, অনেক দ্বিধা সঙ্কোচ কাটিয়ে চৌকিদার বললো, চৌধুরী সাহেবের লড়কী আটটা থেকে ঐ ঘরে······

কোন চৌধুরী সাহেবের লড়কী?

চা বাগানের মালিক চৌধুরী সাহেবের বড় লড়কী···

মনে মনে বিরক্ত হলেও চিত্রা বললো, তা হোক, তুমি বল আমি······

অশেষবাবু এসেই দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন। আর বলেছেন, কেউ যেন বিরক্ত না করেন।

চিত্রা একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললো, আচ্ছা তুমি যাও।

পনের বিশ মিনিটের মধ্যে চিত্রা জিনিষপত্র গুছিয়ে নিল। তারপর চৌকিদারকে ডেকে তার হাতে দশটা টাকা দিয়ে বললো, এটা তুমি রেখে দাও। এবার আমার জন্য একটা রিক্সা ডেকে দাও।

আপনি এখুনি চলে যাবেন?

হ্যাঁ।

একটু পরেই রিক্সা এলো।

চিত্রা দুটো প্যাকেট আর একটা চিঠি চৌকিদারকে দিয়ে বললো, কাল সকালে চৌধুরী সাহেবের মেয়ে চলে গেলে এগুলো অশেষবাবুকে দিয়ে দিও।

অশেষ, তুমি ভালবাস বলে এক কার্টন ষ্টেট এক্সপ্রেস সিগারেট আর আমার নিজের হাতে তৈরী এক শিশি মিষ্টি আমের আচার রেখে গেলাম।

দশ বারো বছর আগে এই চিত্রাঙ্গদার গান গাইতে গাইতেই তোমাকে আমি সব কিছু বিলিয়ে দিয়েছিলাম। তারপর হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলাম, আমার জীর্ণ ভাঙা মন্দির থেকে দেবতা উধাও হয়ে গেছেন। মন্দিরে নতুন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করতে পারতাম, কিন্তু দেবতাকে পাব না বলে সে কাজ করিনি। তবু সেই পুরানো স্মৃতি রোমন্থন করে দিন কাটাচ্ছিলাম। কিন্তু এবার দেখলাম সে স্মৃতি রোমন্থন করতেও বিস্বাদ লাগছে। আর না। প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আর কোনদিন চিত্রাঙ্গদার গান গাইব না। পারব না।

মালা

## ভরা থাক স্মৃতি সুধায়

জি, টি রোডের মোড়েই ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিলাম। আগে ভেবেছিলাম একেবারে ভিতরে নিয়ে যাব। সেই বাঁড়ুজ্যে পাড়ার শেষে, কেষ্ট চ্যাটার্জী লেনের মোড়ে। কিন্তু না। জি, টি, রোডের মোড়েই নেমে পড়লাম। হঠাৎ মনে হল, এতো পরিচিত লোকের বাড়ীর সামনে দিয়ে ট্যাক্সি চড়ে যাওয়া ঠিক হবে না। উচিত না। খারাপ দেখাবে। পরিচিত সবাই আমাকে ভুল বুঝবে।

আরো অনেক কিছু মনে করে ট্যাক্সি থেকে নেমে পড়লাম। আগে, দশ বছর আগে যখন আমি কলেজে পড়তাম, এই বালী থেকে রোজ কলকাত যাতায়াত করতাম, তখন কোনদিন রিক্সা চড়েও এই রাস্তা দিয়ে যেতাম না। দেরী হয়ে গেলেও যেতাম না। ভাল লাগত না। ইচ্ছা করত না। এই রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কতজনের সঙ্গে দেখা হতো, গল্প করতাম। কখনও এর ওর বাড়ীতে ঢুকে পড়তাম, আড্ডা দিতাম, মুড়ির মোয়া-নারকেলের সন্দেশ, বেলের মোরব্বা খেতাম। আজ যদি তাদেরই বাড়ীর সামনে দিয়ে ট্যাক্সি চড়ে যাই, তাহলে ওরা সবাই কি ভাববেন, এতকাল পরে আসছি বলে কি মণ্টুদাদের বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে একবার চীৎকার করব না, মেজ বৌদি ! কি খবর ?

অন্তত সপ্তাহে দু'দিন এই রকম বেলা তিনটে সাড়ে তিনটের সময় আমি কলেজ থেকে ফিরতাম। চুয়াম নম্বর বাস থেকে বালী থানার মোড়ে নেমে বাঁড়ুজ্যে পাড়ার দিকে এগুতেই মণ্টুদাদের বাড়ীটা নজরে পড়ত। ভাবতাম, ও সময় মেজ বৌদিকে ডাকাডাকি করা ঠিক হবে না। খাওয়া দাওয়া মিটতেই বেলা হয় একটা দেড়টা। কোন কোনদিন দুটো। তারপর মেজবৌদি নিজের ঘরে যায়। শোয়। শুয়ে শুয়ে বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্করের উপন্যাস পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়ে। বইটা বুকের উপরেই পড়ে থাকে। ঘুমের মধ্যেও হাত দুটো দিয়ে বইটা ধরে রাখত। মেজবৌদির তখনও কোন বাচ্চা হয়নি। কিন্তু তা হোক। ঘুমের মধ্যে, অচেতন মনে ও যেন মা হতো। বুকের উপর পড়ে থাকা বইটাকেই আলতো করে ধরে রাখত। পড়ে না যায়, আঘাত না পায়। একটু নড়া-চড়া করতে গিয়ে বইটা গড়িয়ে এদিক-ওদিক হলেই ঘুমন্ত

মেজবৌদির হাত দুটো হঠাৎ সতর্ক হয়ে উঠত। বইটাকে চেপে ধরত অথবা পাশে রেখে দিত।

মেজবৌদির ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আমি বহুদিন এ দৃশ্য দেখেছি। চুপ করে দেখতাম। ডাকতে গিয়েও ডাকতে পারতাম না। কষ্ট হতো। মনে হতো মেজবৌদি স্বপ্ন দেখছে। বিভোর হয়ে স্বপ্ন দেখছে। আমি ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে আর ও ঘরের মধ্যে শুয়ে আছে। কিছুই দূরত্ব নয়। তবু মনে হতো মেজবৌদি আমার থেকে অনেক দূরে, অনেক উঁচুতে চলে গেছে। একেবারে অন্য রাজ্যে, অন্য জগতে।

আমি নির্বাক হয়ে, বিস্মিত হয়ে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতাম। দেখতাম। মেজবৌদিকে সকাল সন্ধ্যায় শত রূপে অজস্রবার দেখেছি, তাকেই আমি নতুন করে দেখতাম। ঘুমন্ত অবস্থায় সুন্দরী মেজবৌদিকে অপরূপ লাগত। ঘুমন্ত মানুষের যে নতুন রূপ, বিশেষ সৌন্দর্য আছে তা মেজবৌদিকে দেখেই আমি প্রথম জানলাম। মানুষের কথায় তার মনের হদিশ পাওয়া যায়, কিন্তু সব সময় সব কথা বোঝাবার জন্য কথা বলতে হয় না। বলা যায় না। দরকার হয় না। নীরবতার একটা নিজস্ব ভাষা আছে। তখন যে কলেজে পড়ি। সঙ্গে সঙ্গে রবি-ঠাকুরের গানের লাইন মনে পড়ত। 'আমার না-বলা বাণীর ঘন যামিনীর মাঝে, তোমার ভাবনা তারার মত রাজে।'

কোনদিন হঠাৎ যদি ওর ঘুম ভেঙ্গে যেত, গরমে বা অন্যকোন কারণে, আমাকে দরজার বাইরে অমন করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে চমকে উঠত। ব্লাউজের দুটো টিপকল যে খুলে গেছে, তা খেয়াল না করেই আমার সামনে এসে বলত, কিরে, দাঁড়িয়ে আছিস কেন, আমাকে ডাকতে পারিসনি?

—তুমি যে ঘুমুচ্ছিলে।

—তাই বলে তুই দাঁড়িয়ে থাকবি?

আমি কি জবাব দেব? মেজবৌদির দিকে তাকিয়ে শুধু একটু হাসলাম। বলতে পারলাম না, মেজবৌদি, ঘুমিয়ে থাকলে তোমাকে যে কত সুন্দর দেখায় তা তো তুমি জান না। মন্টুদাও হয়ত জানে না, কিন্তু আমি জানি।

আমি মুখে কিছু না বললেও মনে মনে আরো কত কি বলতাম। কথা বলত মেজবৌদি, মা কোথায়?

—নীচে।

—ঘুমুচ্ছেন?

—না, না, আরো তিন-চারজন বুড়ীর সঙ্গে গল্প করছেন।

—বোস। চা করে আনি।

মেজবৌদি চা করতে নীচে চলে যায়। আমি ঘরের কোণার ইজি চেয়ারে বসি। একটু এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখি। হয়ত উঠে গিয়ে ড্রেসিং টেবিলের উপর থেকে ফ্রেমে বাঁধান মণ্টুদা আর মেজবৌদির ছবিটা হাতে নিই। দেখি। হয়ত মেজবৌদিকেই বেশি দেখি। ছবিটা ঠিক জায়গায় রেখে ঘরের মধ্যে পায়চারি করি। হঠাৎ কি মনে করে মণ্টুদার সিগারেট কেসটা হাতে নিই। খুলি। দেখি। একটার পর একটা ক্যাপষ্টান সাজান রয়েছে। বেশ দামী সিগারেট। কলেজের দু-একজন বড়োলোক বন্ধুকে কিনে খেতে দেখি। চা নিযে মেজবৌদি ঘরে ঢুকলেও আমি টের পাইনা। কিরে, সিগরেট খেতে ইচ্ছে করছে বুঝি?

আমি চমকে উঠি। একটু সামলে নিয়ে হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করি, আচ্ছা, তোমার পায়ে কি হাড় নেই?

--তার মানে!

—এমন নীরবে তুমি হাঁটা চলা কর বলেই জিজ্ঞাসা করছি।

-তোকে একটা থাপ্পড় লাগাব।

কোন কোনদিন সত্যি কারণে-অকারণে থাপ্পড় লাগায়।

ট্যাক্সি থেকে নেমে বঁাড়ুজ্যে পাড়ার দিকে তাকাতেই মনে পড়ল এইসব। আরো কত কি। আজ যদি ঐ বাড়ীর সামনে দিয়েই ট্যাক্সি চড়ে যাই, তাহলে.........

ভাবতেও খারাপ লাগল। এখন যদি মেজবৌদি জানলার ধারে বসে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকে, যদি বাইচান্স আমাকে ট্যাক্সি চড়ে যেতে দেখে? হয়ত চোখাচোখি হয়ে যাবে। ট্যাক্সিতে গেলেও আমি উপরের দিকে না তাকিযে পারব না। নিশ্চয়ই তাকাব। তাহলে সত্যি খুব লজ্জার ব্যাপার হবে।

ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিযে ভালই লাগল। খুব ভাল লাগল। সামনেই কেদার ঘাট। ওদিকে একবার তাকাতেই যেন গঙ্গার শান্ত, স্নিগ্ধ, মিষ্টি হাওয়ায় মনটা জুড়িযে গেল। ছুটীর দিনে, বিশেষ করে গরম কালে, আমরা এক দল গঙ্গায় আসতাম। স্নান করতাম। সাঁতার কাটতাম। সাঁতার কাটতে কাটতে গঙ্গার মাঝখানে চলে যেতাম। তবে রোজ নয়, মাঝে মাঝে। ঘাটে

দু-চারজন অল্প বয়সী মেয়ে থাকলে বাহাদুরী দেখাবার জন্য গঙ্গায় মাঝখানে যেতাম। অনেক সময় ভয় করত অতদূর যেতে, কিন্তু তবুও যেতেই হবে। না গিয়ে উপায় ছিল না। নায়িকারা যদি নায়কের দুর্বলতা জানতে পারে, তাহলে ভালবাসবে কেন?

এই জি. টি, রোডের উপরে দাঁড়িয়েই এইসব ভাবছি। ভাবছি আর হাসছি। দারুণ স্পীডে একটা লরী গা ঘেঁষে চলে যেতেই সরে দাঁড়ালাম। দু-চারজন ছেলে ওদিককার চায়ের দোকানে বসে বসে আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে। ভাবছে আমি কি ক্যাবলা। ওর যা ইচ্ছা তাই ভাবুক, আমার কিছু আসে যায় না। ওরা শুধু আমার বাইরের দিকটা দেখছে। আমার মনের খবর তো ওরা জানে না। জানে না এই কেদার ঘাটে স্নান করতে এসেই আমি প্রথম চন্দনাকে দেখতে পাই। স্পষ্ট দেখছি ও স্নান করতে করতে আমার দিকে তাকাচ্ছে। আমার দিকে তাকিয়েই আবার চারপাশে দেখে নিচ্ছে। কেউ বুঝতে পারেনি তো?

একটু পাশে দাঁড়িয়ে আরেকবার কেদার ঘাটের দিকে তাকালাম। সেদিনের সব কিছু মনে করার চেষ্টা করলাম। আমিও কি প্রথম ওর দিকে তাকিয়ে ছিলাম? কিন্তু অসম্ভব নয়, বরং সেটাই স্বাভাবিক। আমি যে তখন নায়ক। কলেজে পড়ি। তখন তো দু'চোখ দিয়ে শুধু নায়িকা খুঁজে বেড়াই। চন্দনাকে দেখেই মনে হয়েছিল পেয়েছি। যাকে খুঁজছিলাম তাকে পেয়েছি। খুঁজে বেড়াবার পালা আমার শেষ।

ট্যাক্সিটা অনেকক্ষণ ছেড়ে দিয়েছি। আর দেরি করলাম না। বাঁড়ুজ্যে পাড়ার দিকে পা বাড়ালাম।

হ্যাঁ, হ্যাঁ সব মনে পড়ছে, সব চিনতে পারছি। হা ভগবান! থানা কত বড়ো হয়েছে? টমসন স্কুল ঠিক ওর কমই আছে, কিন্তু থানার এতবড় বাড়ী হলো! এতো দেখছি দিল্লীর মতো। দিল্লীর থানাগুলোর নতুন বাড়ী দেখে আমি প্রথম প্রথম ভাবতাম কলেজ। অথবা ফরেন ফার্মের অফিস! এত সুন্দর, এত বড় বাড়ী যে থানা হতে পারে, তা আমার মাথায় আসেনি। আসবে কি করে, যেখানে হাজার হাজার বাচ্চা-বাচ্চা ছেলে মেয়ে শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষায় তাঁবুতে স্কুল করছে, সেখানে যে গভর্ণমেণ্ট নতুন স্কুল বাড়ীর বদলে এমন সুন্দর থানা তৈরি করবে তা ভাবা সত্যি কঠিন। দিল্লীর হাওয়া বালী থানাতেও লেগেছে দেখছি। এবার আরো মনে পড়ছে। এই বিল্ডিংটাই

তো কোন এক ভি-আই-পি উদ্বোধন করেছিলেন। কলকাতার কাগজগুলোতে সে খবর বেশ ফলাও করে ছাপা হয়েছিল। আমি দিল্লীতে বসে এই খবরটি পড়ে তাজ্জব বনেছিলাম। অবশ্য কলকাতার কাগজগুলোতে যত দারোগার নাম ছাপা হয়, ব্রিটেন, আমেরিকা, রাশিয়ার কাগজে এম, পি বা সিনেট সুপ্রীম সোভিয়েটের সদস্যদেরও অত নাম ছাপা হয় না।

হা ভগবান! বালী থানা দেখে আমি কত কি ভাবতে সুরু করেছি। চুলোয় যাক বালী থানা। ঐ বোকা বোকা পেট-মোটা ঘুষখোর সাব ইন্সপেক্টরদের সঙ্গে আমার বা চন্দনার বা মেজবৌদির কোন সম্পর্ক নেই। সুতরাং কি দরকার আজে-বাজে বিষয় চিন্তা করে?

এই তো কেদার ভবন! বালীর রাজ-ভবন। এরা নাকি খুব বড়লোক ছিল। একমন না দু'মন দুধ একবারে এককড়ায় জ্বাল হতো এদের বাড়ীতে। এদের বাড়ীর ছেলেদের কি সুন্দর দেখতে ছিল। দেখলেই মনে হত রাজপুত্তর। রোজ দুধ-ক্ষীর-ননী খায়। তখন আমি এক আনার আলু-কাবলী খেতে পেতাম না। তাই তো বিস্ময় দেখতাম কেদার ভবন। এখন বাইরে থেকে মনে হচ্ছে ঠিক সেদিন নেই। বোধহয় বসন্ত ফুরিয়ে গেছে। এখন তো আমি রোজ দুধ খাই। ওরা আলু-কাবলী খায় না তো?

এতদিন পর বালীতে এসে আমার মাথাটা বোধহয় খারাপ হয়ে গেছে। যা দেখছি তাই নিয়েই ভাবছি। অকারণে অহেতুক ভাবছি। কোন বাড়ীতে বসন্ত আসছে বা যাচ্ছে, কে দুধ খাচ্ছে না আলু কাবলী খাচ্ছে, তা নিয়ে আমার ভাবনা-চিন্তা করার কোন প্রয়োজন নেই, ইচ্ছাও নেই। আমি শুধু তাদের কথাই ভাবব, যারা আমাকে নিয়ে একদিন ভাবত। হয়ত এখনও মাঝে মাঝে ভাবে। আমাকে ভুলতে পারেনি বা কোনদিনই ভুলবে না। ভুলতে পারবে না, ভুলতে চাইবে না। কেউ প্রকাশ্যে, সবাইকে জানিয়ে আমাকে মনে রাখবে; আবার কেউ কেউ হয়ত নীরবে নিভৃতে আমার কথা, আমার স্মৃতি মনে করবে।

এখন এই বাঁড়ুজ্যে পাড়ার মুখে দাঁড়িয়ে নয়, দিল্লীর জীবনের মাঝখানেও আমি মাঝে মাঝে ভাবি ওদের কথা। না ভেবে পারি না। ভাবতেই হয়। ভাবতে ভাল লাগে, হয়ত চিরকালই ভাল লাগবে। শুধু নিছক পরিচিত পরিচিতা ছাড়া ওরা আমাদের কেউ নয়। তবু ওদের মনে রাখতে হবে। রাখতে হয়। সবাইকেই রাখতে হয়। যারা কেউ নয়, তাদের সবাই কি পর না,না তা

কি হতে পারে? নিজের আপন জনের বাইরেও মানুষের প্রিয়জন থাকবে। থাকবেই কম বা বেশী। আমারও আছে, মেজবৌদি ও চন্দারও আছে। আমি রাজপুত্তুর রাজকন্যার কথা ভাবব না। শুধু ওদের কথাই ভাবব।

এই বাঁড়ুজ্যে পাড়ার রাস্তা দিয়ে হাঁটতে গেলেই ভাবতে হবে। না ভেবে উপায় নেই, মুক্তি নেই। একেবারে ছোটবেলায় প্রথম টিকা নেবার দাগ যেমন বহুকাল, প্রায় আমৃত্যু থাকে, সেইরকম কৈশোর জীবনের সন্ধিলগ্নের স্মৃতি বহুকাল উজ্জ্বল থাকে। আমারও আছে।

—এই বাবলুদা।

—কি?

—রোজ গঙ্গায় গিয়ে কি কাণ্ড কর বলতো?

—কি অবার করি। স্নান করি, স'াতার কাটি।

—ঐ তোমার স্নান করার ছিরি—

—কেন, কি হলো?

—অতক্ষণ ধরে কেউ স্নান করে, অতক্ষণ ধরে স্নান করলে অসুখ হয় না?

বর্ষার জলে গঙ্গা ভরে যায়। এ জলে বেশীক্ষণ থাকলে অসুখ-বিসুখ হয় বলে অনেক বুড়ো-বুড়ির কাছে শুনেছি, কিন্তু মায়া এসব জানল কেমন করে?

—তোমাকে কে বললে?

—কে বললো তা দিয়ে তোমার কি দরকার? তুমি অতক্ষণ নতুন জলে স্নান করবে না।

আমি হাসতে হাসতে মায়ার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, করব না?

—না। ও একটু থেমে আবার বললো, তাছাড়া···

—তাছাড়া কি?

—এই সময় কত রকমের বিপদ হয় জান?

কথাটা মিথ্যে নয়, তবে পুরোপুরি সত্যিও নয়। কদাচিৎ কখনও বিপদ তো হয়ই। হবেই। তাবলে রোজ রোজ সবার বেলায় তো হতে পারে না।

—বিপদ কি সবার হয়?

—তুমি বড্ড তর্ক কর বাবলুদা।

সেকলে স্কুলের ক্লাস নাইনের ছাত্রী মায়া আমার প্রেমে না পড়লেও

ভালবাসত। লক্ষ্মী পুজোর প্রসাদ দেবার সময় শশা-কলার বদলে বেশি করে ছানার সন্দেশ আর নারকেলের নাড়ু আমার হাতে গুঁজে দিত। না দিয়ে পারত না গাঙ্গুলী বাগানের পাশে তিন-চারটে কদবেল গাছ ছিল। সেখান থেকে কদবেল চুরি করলে অন্তত একটা ওকে না দিয়ে পারতাম না। সেই মায়া একদিনের কলেরায় মারা গেল। বিকেল বেলার দিকেই শুরু হয়েছিল, কিন্তু কাউকে বলেনি। সকাল বেলায় যখন আমি খবর পেলাম, ছুটে গেলাম, তখন মায়ার মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে। এই বাঁড়ুজ্যে পাড়ার রাস্তা দিয়ে কলেজ না গিয়ে সেদিন শ্মশান গেলাম। এর আগে আমি শ্মশান দেখলেও কাউকে পোড়াতে নিয়ে যাইনি। কি বিভৎস, কি মর্মান্তিক সে দৃশ্য। বাপরে বাপ। ভাবতে গেলেও গা শিউরে ওঠে। আজও ভাবতে গিয়ে কেমন লাগছে।

এই বাঁড়ুজ্যে পাড়ার এই রাস্তা দিয়ে খুচরো পয়সা ছড়াতে ছড়াতে মায়ার ডেড-বডি নিয়ে গিয়েছিলাম শ্মশানে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ছাই হয়ে শেষ হয়ে গেল। যে সামান্য পরিচয়টুকু থাকত, তাও গঙ্গা জলে ধুয়ে দেওয়া হলো। এক এক করে সবাই কলসী ভর্তি গঙ্গাজল এনে ঢালল মায়ার চিতায়। আমি পারলাম না। কলসী ভর্তি গঙ্গাজল এনে ওর চিতা ধুতে আমার সাহস হলো না। তখন যে গঙ্গায় নতুন জল। সবে বর্ষা নেমেছে। ওর অসুখ করবে না?

মায়া চলে গেল, কিন্তু শেষ হলো না। কলেজ থেকে ফেরার পথেও আমি ওকে দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতাম। দেখতাম কদবেল খাচ্ছে, অথবা তেঁতুল মাখা। কখনও শুনতাম, এই বাবলুদা। এখন তুমি কলেজ থেকে ফিরছ? উত্তর দেবার জন্য আমি উপরের দিকেই তাকাতেই দেখতাম, ও পালিয়েছে। ভাবতাম, এক্ষুণি উঁকি দেবে, কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়াবার পর বুঝতে পারতাম ও সারা জীবনের মত লুকিয়ে পড়েছে।

আরো কত কি! বহুদিন পর্যন্ত বাঁড়ুজ্যে পাড়ার রাস্তা দিয়ে যেতে পারতাম না। মনে হতো খই আর খুচরো পয়সাগুলো আমার গায়ে এসে পড়ছে আর জ্বলে যাচ্ছে। রাতে ঘুমিয়ে পড়ার পরেও বহুদিন পর্যন্ত হরিধ্বনি শুনতে পেতাম। তখন বালীতে হরদম কলেরায় লোক মারা যেত। কিন্তু যে কেউই মারা যাক না কেন, আমার মনে হত মায়াই মারা গেল।

—হ্যাঁরে বাবলু, কোথায় ছিলি রে এতদিন?

—কোথায় আবার থাকব, এখানেই ছিলাম।

—তবে তোকে দেখি নি কেন রে?

—আমি আজকাল অন্য দিক দিয়ে যাতায়াত করি।

—কেন?

আমি কিছুক্ষণ মাথা নীচু করে চুপ করে থাকার পর বললাম, এমনি।

মেজবৌদি বিশ্বাস করল না। বুঝল কিছু একটা ব্যাপার আছে, কিন্তু আমি বলছি না।

—এমন কি কারণ যা আমাকেও বলা যায় না?

—না, তা নয়।

—তবে?

—এই রাস্তা দিয়ে মায়ার ডেড-বডি নেওয়া হয়েছিল বলে······

আর বলতে হয়নি। মেজবৌদি আমার কাছে এগিয়ে এসে হাত দুটো চেপে ধরে বললো, ভয় করে?

—ঠিক ভয় নয় তবে কেমন কেমন লাগে।

মেজবৌদি হাসলেন। বললেন, তুই কলেজে পড়লেও বড় হতে পারিসনি।

আমি কিছু না বলে মাথা নীচু করেই বসে রইলাম।

—ভয় লাগে বলে কি রাস্তা দিয়ে হাঁটাই বন্ধ করে দিবি? এক মুহূর্তের জন্য থেমে আমার মুখের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে বললেন, নদীর পাড় দিয়ে হাঁটলে নদী পার হওয়া যায় রে?

কত বছর আগে মেজবৌদি কথাটা বলেছিল, কিন্তু কথাটা আজও কানে বাজে। সেদিন জানতাম না, বুঝতাম না ডেডবডি নিয়ে যাবার ভয় বা ভূতের ভয়ের চাইতে অনেক বেশি মারাত্মক ভয়ের সন্মুখীন হতে হয় মানুষের জীবনে। জীবনের পথে এগুতে যেসব সমস্যা ভয়ের মুখোমুখি হতে হয়, তাদের কাছে ভূতের ভয় কিছুই নয়। এমন কোন সমস্যা, বিপদ-আপদ বা ভয়ের কারণ ঘটলেই এই বাঁড়ুজ্যে পাড়ার মণ্টুদার স্ত্রী আমার সেই অনন্যা মেজবৌদির কথা মনে হয়, নদীর পাড় দিয়ে হাঁটলে কি নদী পার হওয়া যায়?

কথাটা ভারি সুন্দর। মেজ বৌদির মত একটা মিষ্টি সুন্দরী মেয়ের কাছে যে এত বড় তাৎপর্যপূর্ণ কথা জানতে পারব, শিখতে পারব, তা আগে ভাবতে পারিনি। ভাবতে পারিনি আরো অনেক কিছু। কথাটা শুনে আমি চমকে উঠে অবাক বিস্ময়ে চেয়েছিলাম ওর দিকে।

—কিরে বাবুল, অমন করে চেয়ে আছিস কেন ?

—ভারি সুন্দর কথাটা বললে তো।

—এ তো খুব সাধারণ কথা।

—তোমার কাছে যা সাধারণ আমার কাছে তাই অসাধারণ।

আজ এত বছর পরে বালী এসেছি। এই বাঁড়ুজ্যে পাড়ার মুখে দাঁড়িয়ে মেজ বৌদির কথা ভাবতে গিয়ে বেশ বুঝতে পারছি সেদিন ঠিকই বলেছিলাম। প্রথম যৌবনের ভাবাবগে একটুও বাড়িয়ে বলিনি।

আস্তে আস্তে সামনের দিকে এগুতে লাগলাম। হাতে বেশীক্ষণ সময় নেই। সন্ধ্যা লাগতে না লাগতেই কলকাতা ফেরা দরকার। রাত্রেই কয়েকজনের সঙ্গে দেখা করতে হবে। তারপর শেষরাত্রে উঠতে হবে। ছ'টায় প্লেন। সাড়ে পাঁচটার মধ্যে নিশ্চয়ই দমদম পৌঁছতে হবে। ভোরের প্লেনে যাবার এই ঝামেলা। রাত থাকতে উঠে বাথরুমে ঢুকতে হবে। বাথরুম থেকে বেরিয়ে সুটকেশ ঠিকঠাক করে পাঁচটায় নিশ্চয়ই হোটেল থেকে রওনা হতে হবে। ভীষণ বিশ্রী লাগে। অথচ উপায় নেই। কালকে দিল্লীতে অফিস আছে। আমি সব কিছু না হলেও অনেক কিছু পারি। পারিনা ভোরবেলায় উঠতে। কিছুতেই পারি না। পারলেও ভীষণ কষ্ট হয়। অস্বস্তি হয়। ভোরবেলার ঐ আমেজটুকু হারাতে বড় কার্পণ্য আমার।

—আরে! বাবলু না ?

হঠাৎ ভদ্রলোককে থমকে দাঁড়িয়ে আমার নাম বলতে শুনে আমি চমকে উঠলাম।

—হ্যাঁ।

—আমাকে চিনতে পারছিস ? ভদ্রলোক এবার হাসতে হাসতে প্রশ্ন করলেন।

—না। ঠিক চিনতে পারছি না।

—তুই তো এখন দিল্লীওয়ালা! চিনতে পারবি কেন ?

খুব সঙ্কোচের সঙ্গে জানতে চাইলাম, আপনার নামটা জানতে পারি ?

—আরে আপনি আপনি করছিস কেন ? আমি পটল। হাসি মুখে পান চিবুতে চিবুতে ভদ্রলোক নিজের পরিচয় দিলেন।

—পটল!

কোন পটল, ব্যাঙাদার ভাই ? সরখেল পাড়ার ব্যাঙাদার ভাই ? আমার

সঙ্গে সন্তোষ মাষ্টারের কাছে প্রাইভেট পড়ত ? কিন্তু·· ······

ভাবতে গিয়েও বাধা পেলাম। সে পটলের এ দশা হবে কেন? ওরা তো বড়লোক ছিল। বাবা না থাকলেও ব্যাঙাদা লিলুয়ার রেলের কারখানায় বেশ ভাল চাকরি করত। আমি যখন কলেজে পড়তাম তখনই বোধহয় এ্যাসিসট্যান্ট ফোরম্যান ছিলেন। চারশ-পাঁচশ টাকা মাইনে পেতেন। প্রত্যেক বছর পুজোর ছুটীতে হিল্লী-দিল্লী ঘুরে বেড়াতেন। আমরা অনেকেই অবাক হয়ে ব্যাঙাদাকে দেখতাম। রোজ। প্রতিদিন। প্রতি সকালে। কেষ্ট চাটুজ্যে লেনের আমাদের বাসার সামনে দিয়ে রোজ সকালে উনি হেঁটে হেঁটে বেলুড় ষ্টেশনে যেতেন। সেখান থেকে লিলুয়া ওয়ার্কশপের স্পেশ্যাল ট্রেন ধরে কারখানা যেতেন। শীত-গ্রীষ্ম বারো মাস ব্যাঙাদা স্যুট টাই পরে অফিসে যেতেন। অবাক হয়ে না দেখে উপায় ছিল না। দেখতেই হতো। ইচ্ছা না করলেও শুধু আমাকে নয়, সবাইকেই দেখতে হতো।

তখন বালীতে থেকেও বেলুড় মঠ বা দক্ষিণেশ্বর মন্দির যাওয়া আমার মত অনেকের কাছেই বিলাসিতা ছিল। রিক্সা চড়ে যারা উত্তরপাড়ার গৌরি টকিজে সিনেমা দেখত, তাদের সৌভাগ্যে অনেকেই ঈর্ষা করত। সেইকালে ব্যাঙাদা রেল কোম্পানীর পাশে হিল্লী-দিল্লী ঘুরতে যেতেন প্রত্যেক বছর। তাও কি এমনি এমনি যাওয়া? পুরোদস্তুর সাহেবের মত যেতেন। চামড়ার স্যুটকেশ, চকচকে হোল্ডল, টিফিন কেরিয়ার। ব্যাঙাদার হাতে থাকত একটা চামড়ার ব্রিফকেশ, গলায় ক্যামেরা। আর বৌদির কাঁধে থাকত ফ্লাস্ক। কোনবার একটা, কোনবার দুটো।

পটলের সঙ্গে আমি বহুবার হাওড়ায় গিয়ে ব্যাঙাদাকে তুলে দিয়েছি। ব্যাঙাদাকে ডেরাডুন এক্সপ্রেস বা দিল্লী মেলে তুলে দিয়েই আমরা গর্ব অনুভব করতাম; তারপর বাসায় ফিরে এসেই ম্যাপ খুলে বসতাম। বাপরে বাপ। ঐ অত দূরের দিল্লীতে যাবে ব্যাঙাদা? ডেরাডুন! ও তো হিমালয়ের পাশে। একদম হিমালয়ের পাশে। হিমালয়ের ওপাশে তিব্বত। এ পাশে ডেরাডুন। ম্যাপ দেখতে দেখতেই রোমাঞ্চিত হতাম। ব্যাঙাদার জন্ম আরো বেশি গর্ববোধ হতো।

সেই ব্যাঙাদার ভাই এই পটল?

তাই কি কখনও হয়? অসম্ভব। অবাস্তব। সেই পটলের ছিরি এমন কখনই হতে পারে না। আমি সন্তোষ মাষ্টারের মাইনে দশ-বারো তারিখের

আগে দিতে পারতাম না। কিন্তু পটল আর শৈলেন ঠিক এক তারিখে দিয়ে দিত। দেবে না কেন? ব্যাঙ্কে গেলেই টাকা আনতে পারত। অনেক টাকা ছিল ওদের। বাড়ী ভাড়া দিয়েই পটলরা প্রত্যেক মাসে প্রায় দু'শো টাকা পেত। বাবাও রেল কোম্পানীতে চাকরী করে বেশ টাকা রেখে গিয়েছিলেন। এর উপর ছিল ওর দিদি। একমাত্র দিদি। শোভাবাজারের এক বড়লোকের বাড়ীতে তার বিয়ে হয়েছিল। পটলের সঙ্গে আমিও কয়েকবার ওর দিদির বাড়ীতে গিয়েছি। কি দারুণ দারুণ সন্দেশ রসগোল্লা খাওয়াতো! এখনও ভাবতে গেলেই জিভে জল এসে যায়। দিদি যখন মোটরে চড়ে বাপী আসত তখন পটলকে দেখে কে!

—কি হলো তোর? আমাকে চিনতে পারছিস না? আমি সরখেল পাড়ার পটল। সেই সন্তোষ মাষ্টারের কাছে··· ····

সেই পটল। আমি চমকে উঠলাম। আঁতকে উঠলাম। মানে ব্যাণ্ডাদার ভাই?

মুখটা কেমন বিকৃত করে ও জবাব দিল, ঠিক ধরেছ।

আমি বলতে পারলাম না, তোমার এমন দশা কেন? চেহারা এত খারাপ হল কি করে, পরণে এই রকম নোংরা পায়জামা-পাঞ্জাবী কেন? তুমি তো সন্তোষ মাষ্টারের কাছে পড়ার সময়ই ক্যাপষ্টান সিগারেট খেতে, কিন্তু এখন বিড়ি টানছ কেন? দিদির কথা, দাদার কথা, বাড়ী ভাড়ার কথাও জিজ্ঞাসা করতে পারলাম না।

একবার ভাবলাম হয়ত মদ-টদ খাচ্ছে। অথবা জুয়া খেলছে। অথবা রেসের মাঠে সব উড়িয়ে ওর এমন দুর্দশা হয়েছে। কিন্তু এসব কথা তো জিজ্ঞাসা করা যায় না। করলাম না। আমি শুধু ওর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, শরীর এ রকম দেখাচ্ছে কেন?

পটল হেসে উঠল। কেমন যেন একটু অদ্ভুত হাসি। আমার দুরবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করছ?

ও আমার মনের কথা ঠিকই ধরেছে। কিন্তু আমি বললাম, তোমার আবার দুরবস্থা কেন হবে?

—ও আবার সেই অদ্ভুত ভাবে হাসল। বাবলু, ভাই, কেন'র কি কোন জবাব আছে?

—তা ঠিক। তবুও······

পটল নির্বিকার ভাবে বললো, আমি বালী বাজারে একটা ছোট চায়ের দোকান করে কোন রকমে বেঁচে আছি।

এই রকমই একটা কিছু আমি সন্দেহ করছিলাম। —সে কি?

—হ্যাঁ ভাই। আমাদের সব গেছে।

—কি বলছ?

ঠিকই বলছি। সব গেছে। কিছু নেই।

ইচ্ছা ছিল না জিজ্ঞাসা করার, কিন্তু জিভ ফসকে বেরিয়ে গেল, কেন?

খুব জোরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে পটল বললো, সে অনেক কথা ভাই।

—না, না, থাক। এসব তোমাদের প্রাইভেট ব্যাপার।

—কিছু প্রাইভেট না। সারা বালী গ্রামের লোক জানে দাদার কারবার।

—ব্যাঙাদার আবার কি হলো?

—কি হয়নি, তাই প্রশ্ন কর। তাহলে জবাব দিতে সুবিধে হবে।

—তার মানে?

—মানে আর কি? মদ আর মেয়েছেলে! কোন ফ্যামিলী রুইও করতে আর কি চাই?

ব্যাঙাদার স্ত্রীর মুখখানা সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। সুন্দর নিটোল একটা মুখ। নাকে একটা ছোট্ট হীরা বসানো নাকছাবি। স্বামীর গর্বের গরবিনী··· ···

আরো কি ভাবতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু পটলের কথায় বাধা পড়ল। তুমি কিন্তু বিশেষ পাল্টাওনি। চেহারা একটু ভাল হলেও মোটামুটি আগের মতই আছে।

—পালটাব কেন?

—আবার কেন? পালটায়। সবাই পালটায়। না পালটানটাই আশ্চর্য।

প্রথমে পটলকে দেখে যতটা ঘেন্না করতে শুরু করেছিলাম, এখন আর তা করছে না। বরং ওর কথাবার্তা শুনে শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছা করল। সমবেদনা বোধ করলাম মনে মনে।—ঠিক বলেছ।

—তুমি তো ভালই আছ। দু'একদিন এখানে থাকবে তো?

—না ভাই। একটু পরেই চলে যাব।

—এত তাড়াতাড়ি কেন?

—রাত্রে কলকাতায় কয়েকটা জরুরী কাজ আছে।

—দিল্লী ফিরবে কবে ?

—কাল ভোরেই।

—কাল ভোরেই ?

—হ্যাঁ ভাই।

—তাহলে যাবার সময় অন্তত একবার দোকানটা ঘুরে যেও। বাটা কোম্পানীর পাশের গলিতে।

—ঐ শ্মশানে যাবার··· ···

—ঠিক ধরেছ। ঐ শ্মশানে যাবার গলিতেই। পটল হাসল। সেই অদ্ভু • হাসি। যতটা পেরেছি এগিয়ে আছি। মেয়াদ তো আর খুব বেশী দিনের নয় !

—আঃ ! কি সব বাজে কথা বলছ ?

পটল বিড়ি টানতে টানতে হন হন করে চলে গেল। একবারও পিছন ফিরল না, কিন্তু আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম ওর পথের দিকে।

কতক্ষণ অমন করে দাঁড়িয়ে ছিলাম, খেয়াল নেই। হঠাৎ একটা বাচ্চার ডাক শুনে চমকে উঠলাম। 'বাবুল কাকা, বাবুল কাকা', বলে কে ডাকছে ? আশে-পাশে কাউকে দেখতে না পেয়ে উপরের দিকে তাকালাম। দেখি লাল ফ্রক পরে একটি ফুটফুটে সুন্দর মেয়ে জানালার রড ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

—তুমি বাবুল কাকা ?

—হ্যাঁ। তুমি কে ?

—আমি ময়না।

—বাঃ ! ভারী সুন্দর ময়না তো ?

আমি তখনও উপরের জানলার দিকে তাকিয়ে আছি।

—এই বাবুল।

ডাক শুনেই চমকে উঠলাম। সামনে তাকিয়ে দেখি দরজার গোড়ায় মেজবৌদি দাঁড়িয়ে আছে।

—আরে মেজবৌদি ! আমি সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে গেলাম।

—আমি অনেকক্ষণ ধরে তোকে লক্ষ্য করছি।

—তাই নাকি ?

—হ্যাঁ। তবে ভাবতে পারিনি তোকে এমন করে দেখতে পাব।

—কেন ?

—কেন আবার ? তুই তো বালী আসা ছেড়ে দিয়েছিস। মেজবৌদি হাসল, নিজে ডাকতে সাহস হলো না। তাই ময়নাকে বললাম ··

মেজবৌদির তৃপ্তিমাখা মুখখানার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, তাহলে দেখছি আমাকে ভুলে যাও নি ?

—ছেলেদের মত মেয়েরা অত সহজে সব কিছু ভুলে যায় না।

—তাই নাকি ?

—আচ্ছা উপরে চল।

অনেককাল পরে মেজবৌদিকে পাশে পেয়ে ভীষণ ভাল লাগল। পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বার বার ওর দিকে দেখছিলাম।

—বার বার কি দেখছিস ?.

দেখছি তুমি বিশেষ বদলাওনি।

—তাই কখনো হয় ?

—দেখছি তো হযেছে। হঠাৎ মাসিমার ঘরের দিকে নজর পড়তেই জিজ্ঞাসা করলাম, মাসিমা কোথায় ?

—মাতো অনেক কাল হল মারা গিয়েছেন।

—কি হয়েছিল ?

—বিশেষ কিছুই না। সামান্য একটু জ্বর হয়েছিল। তাতেই হঠাৎ হার্টফেল করলেন।

—তাহলে বিশেষ কষ্ট পান নি ?

—একটুও না।

—মণ্টুদার কি খবর ?

—কি আবার খবর ? অফিস আর মোহনবাগান নিয়ে কাটিয়ে দিচ্ছে।

উপরে গিয়ে দেখলাম মেজবৌদির ঘর আগের মতনই ছিমছাম গোছান আছে। তবে ঘরের সঙ্গে এ্যাটাচড্ একটা বাথরুম হয়েছে। মণ্টুদার সিগারেট কেসটাও ঠিক আগের মত আছে। সেই আগের মত একবার হাতে তুলে নিলাম। খুললাম। দেখলাম।

—সিগারেট খাস তো একটা নে।

—তুমি কি পাগল হয়েছ ?

—কেন বাজে লুকোবার চেষ্টা করছিস ?

—তুমি তো আচ্ছা লোক।

—তুই সিগারেট টানতে টানতে পটলের সঙ্গে গল্প করছিলি, আমি বুঝি দেখিনি ?

—তাহলে সেকথা বলবে তো !

সত্যিই মণ্টুদার সিগারেট কেস থেকে একটা সিগারেট বার করে ধরালাম। মেজবৌদি একটু বেরিয়ে গেলেন। দু' এক মিনিটের জন্য। তারপরই ঘুরে এলেন।

—ময়না কোথায় ?

—চাকরটার সঙ্গে বাইরে গেল এক্ষুণি আসবে

—ওর বয়স কত হলো।

—এখনও পুরো পাঁচ হয়নি।

—ও তোমার মতই সুন্দরী হবে

—আমি আবার সুন্দরী হলাম কবে ?

—আগেও ছিলে এখনও আছ।

—তবে দুঃখ কি জানিস, তুই আর আমার শাশুড়ী ছাড়া আর কেউ আমাকে সুন্দরী বললো না।

—কেন মণ্টুদা ?

—ও আমার প্রশংসা করবে ?

—করে না বুঝি ?

—জীবনেও না।

—গোলাপের বাগানের মালি কি গোলাপের মর্যাদা বুঝতে পারে ?

মেজবৌদি আলতো করে আমার গালে একটা চড় মেরে বললো, বাজে বকিস না।

—চড় মারার অভ্যাসটা এখনও আছে ?

একটু পরেই ময়নাকে নিয়ে চাকর ফিরে এলো মেজবৌদি বেরিয়ে গেলেন। আমি ময়নাকে ডাকলাম, শোন।

ময়না দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি আমায় ডাকছ ?

—হ্যাঁ।

—কেন ?

—এমনি। আদর করব।

—বাপি আর মা আমাকে আদর করে।

—তাই নাকি ?

—হ্যাঁ।

—আমিও তোমাকে আদর করব।

—কেন ?

—আমি যে তোমার কাকু হই।

—কাকু কি রাস্তায় থাকে ?

—আচ্ছা তুমি কাছে এসো। সব কথা বলব।

ময়না খানিকটা এগিয়ে এসে বললো, আরো কাছে আসব ?

হ্যাঁ অনেক কাছে, একেবারে আমার কোলের মধ্যে। ঠিক মেজবৌদি একটা ছোট্ট সংস্করণ। ওকে আদর করতে করতে একবার, এক মুহূর্তের জন্য মনে হলো আমি মেজবৌদিকেই আদর করছি। আমি চমকে উঠে তাড়াতাড়ি ময়নাকে ছেড়ে দিলাম। আর কাছে ধরে রাখতে পারলাম না। লজ্জা করল। যাও এবার তুমি খেলতে যাও।

ছোট ময়না চলে যেতেই বড় ময়না খাবারের প্লেট হাতে করে ঘরে এলেন।

—এই সময় কেউ কিছু খায় ? মেজবৌদিকে দেখেই প্রশ্ন করলাম।

মেজবৌদিও নির্ব্বিবাদে বললো, কেউ খায় কিনা জানিনা, তবে আমি দিলে তুই নিশ্চয় খাবি।

—কি করে জানলে ?

—আমি জানি।

—কিন্তু কি করে ?

—মেয়েরা জানতে পারে।

—কি জানতে পারে ?

—জানতে পারে কে কথা শুনবে, কে শুনবে না।

—আমি তোমার কথা শুনব, তা জানলে কেমন করে ?

মেজবৌদি হাসতে হাসতে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, আমি তোর সব কথা জানি।

কথাটা শুনেই চমকে উঠলাম। ভয় পেলাম। সত্যি কি মেজবৌদি

আমার সব কথা জানে ? চন্দনা আমাকে ভালবাসত, ওকে না দেখলে আমার ভাল লাগত না, সে সব জানে নাকি ? নাকি মাযাকে কদবেল এনে দিতাম বলে ও কথা বললো ?

অথবা ?

অথবা কি ? মেজবৌদি ঘুমিযে থাকলে আমি যেন মোহগ্রস্ত হযে ওকে দেখতাম, দেখে খুশী হতাম, তা কি ও টের পেতো ?

না, না, তা কি করে সম্ভব ? ঘুমিযে থাকিলে কি সে-সব টের পাওযা যায ? ভাল কথা, উঠে ওর ব্লাউজের-টিপ কল খোলা দেখে আমার সম্পর্কে কিছু ভাবেনি তো যে আমি চুরি করে দেখছিলাম ? আমার চোখ মুখ দেখে বুঝতে পারেনি তো মনের অবস্থা ?

—তার মানে ? স্বাভাবিক হযে প্রশ্ন করলাম।

—মানে আবার কি ? জানি তুই আমায ভালবাসিস তুই আমার কথা শুনবি।

ভালবাসি কথাটা শুনেই লজ্জায লাল হযে গেল সারা মুখ বললাম, বলো তোমাকে আমার ভাল লাগে।

—ঐ একটু বেশী ভাল লাগাকেই ভালবাসা বলে।

তাই নাকি ? তাতো আগে জানতাম না, বুঝতাম না। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে মেজবৌদি ঠিকই বলছে। সত্যি ওকে আমার খুব ভাল লাগত। প্রায চন্দনার মত। রোজ একবার মেজবৌদিকে না দেখলে ভাল লাগত না। বাসে না গিযে ট্রেনে যাতাযাত করলে মেজবৌদির বাড়ীর সামনে দিযে যেতাম না। দেখা হতো না। দিন কাটত, সন্ধ্যাও পার হতো। তারপর কিছুতেই পারতাম না। আর কেউ না বুঝলেও ওকে দেখার জন্য ছটফট করতাম। ফিজিক্স ছেড়ে কেমিষ্ট্রি, কেমিষ্ট্রি ছেড়ে অঙ্ক নিযে বসতাম। তবু মন বসত না। শেষ পর্যন্ত সত্যি সত্যিই একবার মেজবৌদিকে দেখতে যেতাম। না গিযে পারতাম না।

—কি রে এখন এলি ?

—ভাবলাম একবার ঘুরে যাই।

—আমিও তোর কথা ভাবছিলাম।

মেজ বৌদি আমার কথা ভাবছিল শুনে গর্বে আনন্দে আমার বুক ভরে উঠত। আমার বুক ভরে উঠত আমার কথা ভাবছিলে কেন ?

—রোজ তোর সঙ্গে আড্ডা দিযে দিযে এমন হযে গিযেছে।

—এমন হযে গিযেছে মানে ?

—একদিন তুই না এলে কেমন লাগে

ঘরের চারপাশে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, মণ্টুদা কোথায় ?

—কোথায আবার, তাসের আড্ডায।

—মাসিমা ?

—মা তো সন্ধ্যে লাগতে লাগতেই শুযে পড়েন

আমি বেশ বুঝতে পারতাম একটা শূন্যতার বেদনা মেজবৌদিকে সব সময কষ্ট দিত। মণ্টুদার মত লোক হযনা। এমন সৌম্য শান্ত, স্বল্পবাক লোক সারা বালীগ্রামে খুব কম আছে। বনেদী বাড়ীর ছেলে হযেও সঙ্গীত নৃত্যচর্চার নাম করে রাতের অন্ধকারে অলিতে গলিতে যাবার অভ্যাস নেই। তাছাড়া মাসীমার মত মণ্টুদাও অত্যন্ত শান্তিপ্রিয মানুষ। কোন ঝুট-ঝামেলায নেই। অনার্স নিযে বিযে পাশ করার পরই সাহেবী কোম্পানীতে মোটা মাইনের চাকরি। ভাড়াটের টাকায সংসার চালাতে হয না। মণ্টুদা রসিদ লেখেন, কিন্তু টাকাটা মাসিমার। মাসিমা মাঝে মাঝে বকাবকি করেন, হাঁরে সোনা খোকা, টাকা দিযে আমি কি করব রে ?

—কি করবে তা আমি কেমন করে বলব ? তবে এ টাকার মালিক তুমি।

—তুই কি আমাকে খেতে পরতে দিচ্ছিস না যে আমার টাকা লাগবে ?

মণ্টুদাকে চুপ করে থাকতে দেখে মাসিমাই আবার শুরু করেন, হরিসভায কেত্তন শোনার পরে রোজ কিছু দিই কিন্তু তা তো বৌমাই দেয।

মণ্টুদা আর দেরী করতে পারে না। তাসের আড্ডায সবাই অপেক্ষা করছে। ঘর থেকে বেরুতে বেরুতে বলে, ও সবই হরিসভায দিযে দাও।

শেষ পর্যন্ত ঐ ভাড়ার টাকা মেজবৌদির কাছেই আসে। তবে মণ্টুদা জানতে পারে না। আমি জানি, আমার সামনেই মাসীমা অনেকবার মেজ-বৌদিকে টাকা দিযেছেন। আমাদের উদয সঙ্ঘের সরস্বতী পূজা বা লাইব্রেরীর জন্য মেজবৌদি চাঁদা দিত। একবার ডেকরেটরের বিল পেমেণ্ট করতে না পারায ভীষণ বিপদে পড়েছিলাম। মেজবৌদি জানতে পেরে বিলের পুরো-বিয়াল্লিশ টাকাই দিযেছিল। টাকাটা নিতে আমার ভীষণ লজ্জা করছিল। তোমার টাকা নেওযা কি ঠিক হবে ?

—অন্যায় কি হবে ?

—যদি মন্টুদা জানতে পারেন।

—আমি কি তাকে বলতে যাচ্ছি ?

—তা বলবে না, কিন্তু তবুও যদি কোন রকমে জানাজানি হয়ে যায় ?

—কি ভাবে জানাজানি হবে ?

—রসিদ বইতে তোমার নাম দেখে যদি কথায় কথায় কেউ বলে ফেলে ?

—রসিদ বইতে আমার নাম লিখবি কেন, এর ওর নাম লিখে দশ বিশটা রসিদ কেটে ফেল।

অনেকদিন পর হঠাৎ মেজবৌদির কাছে ভাল লাগা-ভালবাসার কথা শুনে আমার অনেক কথা মনে পড়ছে।

—হ্যাঁরে বাবুল তোর সেই ষ্ট্রাইপ দেওয়া সার্টটা কোথায় রে ?

—আছে।

—পরিস না কেন ?

—পরি তো।

—রোজ রোজ এই স্কাই কলারের সার্ট পরবি না তো।

—কেন, তোমার ভাল লাগে না বুঝি ?

—ভাল লাগে। কিন্তু ঐ সার্টটা পরলে তোকে আরো ভাল দেখায়।

কয়েকটা টুকরো টুকরো মেঘ দিয়ে যেমন সারা আকাশ ভরা যায় না, তেমনি কয়েকটা টুকরো টুকরো ভাল লাগা, ভালবাসা দিয়েও মানুষের মন ভরে না। পরিতৃপ্ত হয় না। রাতের আকাশে চাঁদের আলো ভাল লাগে, কিন্তু সে আকাশ তারকহীন হলে সৌন্দর্য হারায়। চাঁদের বৈশিষ্ট ম্লান হয়। মেজবৌদির মনের মধ্যেও কেমন যেন একটু ম্লান আভা লুকিয়ে থাকত। স্বামীর ভালবাসা পেলেও প্রাণভরে তার সান্নিধ্য না পাওয়ায় মেজবৌদির মনের মধ্যে একটা চাপা অতৃপ্তি, অপূর্ণতার ভাব, সামান্য ব্যর্থতার গ্লানি ওকে সব সময় কষ্ট দিত।

ঐ অতৃপ্তি, অপূর্ণতার জন্যই মেজবৌদি আমাকে কাছে টানত ? গুনগ্রাহী ছাড়া কি রূপ যৌবনের সার্থকতা নেই ?

মিষ্টির প্লেটটা সেণ্টার টেবিলে রেখে মেজবৌদি এমন ভাবে আমার দিকে চাইল যে আর কিছু বলতে পারলাম না। মুখ নীচু করে নিঃশব্দে সব মিষ্টিগুলো খেয়ে নিলাম।

—কদিন আছিস ?

—আমি কাল ভোরেই চলে যাব।

—সেকি রে ?

—হ্যাঁ আমাকে যেতেই হবে।

—রাত্তিরটা বালীতে থাকবি তো ?

—না মেজবৌদি। একটু দেখাশুনা করেই ফিরে যাব।

আমি উঠে দাঁড়াতেই মেজবৌদি বললো, ফেরার পথে দেখা করবি তো ?

আমি হাসলাম। একবার ময়নাকে ডাক দাও।

মেজবৌদি নিজে গিয়েই ওঘর থেকে ময়নাকে নিয়ে এলো। আমি ওকে একটু আদর করলাম। আমি যাচ্ছি। আবার পরে আসব।

—কেন ? আবার আসবে কেন ?

—তোমাকে আদর করতে আসব !

—আমি তো ঘুমিয়ে পড়ব।

—ঘুম থেকে তুলে আদর করব।

—ঘুম থেকে উঠেই আমি কাঁদব।

—তুমি তো ভাল মেয়ে। তুমি কাঁদবে কেন ?

—না আমি কাঁদব।

ময়না আর দেরী করল না। পুতুল নিয়ে খেলা করতে ওঘরে চলে গেল। আমিও মেজবৌদির সঙ্গে হ্যাণ্ডসেক করে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লাম।

সামনেই একটা পুকুর। ডানদিকের রাস্তাটা বালী বাজারে গেছে। সামনের রাস্তা দিয়ে সরখেল পাড়ায় যাওয়া যায়। আমি বাঁদিকের রাস্তা দিয়ে যাব। এই তিন রাস্তার মোড়ে শ্মশানকালী পূজা হতো। ঐতো ফুল বেলপাতা পড়ে আছে। কেউ এখানে পা দেয় না। অনেকে আবার কপালে হাত তুলে প্রণাম করে। গঙ্গাস্নান করে ফেরার পথে অনেক বুড়ো-বুড়ি ঐখানে গঙ্গা জল ঢালেন। আমি প্রণাম করলাম না, গঙ্গা জলও ঢাললাম না, কিন্তু মুহূর্তের জন্য দাঁড়ালাম। দশ বারো বছর আগে বালী গ্রামে কলেরা-বসন্তে প্রায় পাইকারী হারে মানুষ মরতো। তাইতো পাড়ায় পাড়ায় রক্ষাকালী শ্মশানকালী পূজা হতো। এক রাত্রের ব্যাপার, কিন্তু তবুও কি এলাহি কাণ্ড হতো।

—কি খবর ? তুমি এখানে ?

একেবারে পাশ থেকে একটা মেয়ের গলা শুনে চমকে উঠলাম। তাকিয়ে

দেখি, শান্তি। আমারও মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, তুমি এখানে?

শান্তি হাসল। আমার বাড়ী এখানে, কিন্তু তুমি তো রাজধানীর বাসিন্দা।

এবার সামলে নিয়ে বললাম, এই তোমাদের সঙ্গে দেখাশুনা করতে এলাম।

—এত বছর পরে মনে পড়ল?

—আমি তো তবু এসেছি। কিন্তু তোমরা? তোমরা তো কোনদিন আমাকে দেখতে যাবে না?

—গেলেও কি দেখা পাবো? তুমি তো এখন অনেক উপরতলার লোক।

—তাই নাকি?

—নিশ্চয়ই।

—তুমি বুঝি খুব নীচুতলার লোক?

—কোন মতে মাষ্টারী করে পেট চালাচ্ছি। নীচুতলার লোক ছাড় আবার কি।

—মাষ্টারী করছ নাকি?

—হ্যাঁ।

—কতদিন।

—বহুকাল।

—একবার দিল্লী এসো।

—বছর দুই আগে স্কুল থেকে আমরা একদল টিচার গিয়েছিলাম

—সেবার টিচারদের সঙ্গে গিয়েছিলে, এবার স্বামীর সঙ্গে এসো।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে শান্তি বললো, বিয়ে করলেই সব মেয়ের ভালো স্বামী জোটে না।

—তার মানে?

—সে দীর্ঘ ইতিহাস।

রাস্তার উপর দাঁড়িয়েই শান্তির সঙ্গে কথা বলছি। তাছাড়া ওর কথা শুনে মনে হলো আলোচনা দীর্ঘ না হওয়াই ভাল। পার্সের মধ্যে থেকে একটা ভিজিটিং কার্ড এগিয়ে বললাম, আমার ঠিকানা রইল। এসো।

শান্তি হাসল।—আমার মত মেয়ে গেলে তোমার স্ত্রী কিছু মনে করবে না?

—এখনও সে সৌভাগ্য আমার হয়নি।

—তুমি বিয়ে করনি?

—না।

—কেন ?

—বিয়ে করলে বৌ পাব, কিন্তু ভালবাসা পাব কি ?

শান্তি আর প্রশ্ন করল না। মুখ নীচু করে একটু দাঁড়িয়ে বললো, চলি। আর দেরি করলে ট্রেন ধরতে পারব না।

আমার জবাবের অপেক্ষা না করেই শান্তি চলে গেল। আমিও বাঁড়ুজ্যে পাড়ার রাস্তা ধরে এগুতে শুরু করলাম।

শান্তি !

বেণীমাধববাবুর একমাত্র মেয়ে শান্তি বরাবরি একটু আদুরে। আমরা বলতাম ন্যাকা। বলার অবশ্য কারণ ছিল। ও বোধহয় আমার চাইতে বছর খানেকের ছোট। কিন্তু বরাবরই গায়ে পড়ে ভাব জমাতে চেষ্টা করত। একটু ফাঁকা রাস্তায় আমাকে দেখলেই কথা বলত। কারণে অকারণে, প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে।

মুখোমুখি হতেই শান্তি বললো, তোমার ওখানেই যাচ্ছিলাম।

—কি ব্যাপার ?

একটা ছোট স্লিপ আমার হাতে এগিয়ে দিয়ে বললো, কলেজ থেকে এনে দেবে ?

স্লিপটা না পড়েই বললাম, তোমাদের কলেজে নেই ?

—আমাদের কলেজে থাকলেও পাওয়া যায় না।

আমি জানতাম ওর সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। কারণ ও একটু কথা বলবার জন্যই বইটার কথা আমাকে বললো। ও বই আনার জন্য আবার অনুরোধ করলে, তারপর আমি বই এনে দেব। ও বই ফেরত দিতে দেরী করবে। আমি তাগাদা দেব বা ও নিজে এসে জানাবে পরে দেবে। এভাবেই তো ভাব জমবে। তখনকার দিনে কলেজের, পাড়ার ছেলেমেয়েরা তো এইভাবেই ভাব জমাতো। ভালবাসার খেলা খেলত। আকাশের চাঁদ চাইলেও পাওয়া যায় না বলেই সব শিশু চাঁদকে ভালবাসে। 'আয় আয় চাঁদ মামা'বলে সে ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু যা হাত বাড়ালেই পাওয়া যায়, যাকে পাবার জন্য কোন প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় না, সাধনা করতে হয় না, তাকে কোন শিশু, কোন মানুষই চায় না। ভালবাসে না। শান্তিকেও আমি ভালবাসতাম না। বরং ঘেন্না করতাম। ওর রূপ যৌবন নিয়ে বিকাশ বা শ্যামলের সঙ্গে হাসাহাসি করতাম।

একবার তো একটা টেনিস বলে কাদা মাখিয়ে ছুঁড়েই মেরেছিলাম। এত বছর পর হঠাৎ আজ, এমন সময় মনে হলো অমন করে বল ছুঁড়ে মারা ঠিক হয়নি। ওর ব্যথা লেগেছিল। কষ্ট হয়েছিল। একবার পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলাম। না, শাস্তিকে দেখা যাচ্ছে না। ওকে দেখতে পেলে হয়ত সেদিনের অন্যায়ের জন্য ক্ষমা চাইতাম।

ঠিক আছে, চিঠিতে ক্ষমা চাইব। কিন্তু এতক্ষণে খেয়াল হল ওর ঠিকানাটা জানা হল না। বেণীমাধব বাবুর বাড়ীতে গেলে ঠিকানাটা জানা যাবে। কিন্তু হঠাৎ এত বছর পর ওদের বাড়ীতে হাজির হয়ে শাস্তির ঠিকানা চাওয়া কি ঠিক হবে? বোধ হয় না।

ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চলেছি। রাস্তাটা সাপের মতো এঁকে বেঁকে চলেছে। আমিও এতদিন পর বালীতে সোজা চলতে পারছি না। এঁকে বেঁকে যাচ্ছি। মনের মধ্যে কেমন যেন লাগছে। এতদিন পর বালীতে এসে যে চাঞ্চল্য, যে আনন্দ অনুভব করব, তা পাচ্ছি না। কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছি মনের মধ্যে। শরীর খারাপ লাগছে নাকি? হাঁটতে হাঁটতেই বাঁহাত দিয়ে হাতের নাড়ীটা একবার দেখলাম। একবার কপালে হাত দিলাম। কই, কিছু হয়নি তো? সব ঠিক আছে। আসল কথা, যে ছবিগুলো যে ভাবে টানান ছিল এখন আর সে ভাবে দেখতে পারছি না। কোন ছবি ঝরে পড়ে গেছে, কোন ছবি আবার ধুলো বালিতে ভরে গেছে। ঐ রথওয়ালা বাড়ীর সামনে দিয়ে কে আসে? মনে হচ্ছে চিনি। খুব ভাল করে চিনি। কি যেন ওর নাম? আগেও কি ওর চশমা ছিল? ঠিক মনে পড়ছে না। ওর এক দাদা ফুটবল খেলতেন না? হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে। একবার আই-এফ-এ শীল্ডের খেলায় হ্যাট-ট্রিক করায় সব কাগজে ছবি ছাপা হয়েছিল। সেদিন সারা বালীগ্রাম ওর জন্য গর্ববোধ করেছিল।

এবার মনে পড়েছে। ব্যানার্জী ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসের ওরাই মালিক। এমন কিছু নয়। মাসে মাসে হয়ত দু-হাজার টাকা আয় হতো ঐ ছোট্ট কারখানা থেকে, কিন্তু তখনকার দিনে সে-ই এক বিরাট ব্যাপার ছিল। পাড়ার সবাই ওদের খাতির করত। অনেকে তো ভয়ও করত। আর কোন বাড়ী নয়, সারা পাড়ার মধ্যে শুধু ওদের বাড়ীই বছর বছর রং হতো। ওদের একটা ভাঙা অষ্টিন গাড়ী ছিল, ধাক্কা না দিলে সে গাড়ী কোনদিন ষ্টার্ট হতো না। ওর কাকা, কানাইদা, ব্যানার্জী ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসের আসল মালিক, গাড়ীর

মধ্যেই বসে থাকতেন আর কারখানার চার পাঁচজন ছেলে ধাক্কা দিয়ে গাড়ী ষ্টার্ট করত। মাঝে মাঝে আমিও গাড়ী ধাক্কা দিতাম। পরে দিতাম না। ওর কাকা এক নম্বরের ছোটলোক ছিল। পাড়ার বহু ভদ্র ছেলে ওর কারখানায় পার্ট টাইম কাজ করত। আমার কয়েকজন বন্ধুও কাজ করত। ওর কাকা মাঝে মাঝেই দপ করে জ্বলে উঠত। কি বিশ্রী নোংরা ভাষায় ওর কাকা ঐ সব গালাগালি দিতেন তা মুখে আনা যায় না। কথায় কথায় বাপ-মা তুলে গালাগালি। কখনও কখনও জুতো দিয়ে পেটাতেন বা লাথি মারতেন। আমার এক বন্ধু গণাকে ঐভাবে মারতে আর গালাগালি দেবার পর থেকে আমি ওর ভাঙা অষ্টিনে ধাক্কা লাগাতাম না। ঐ গাড়ীতে হাত দিতে ঘেন্না করত। সুযোগ পেলে রাত্রির অন্ধকারে সারা গাড়ীতে গোবর মাখিয়ে রাখতাম। একবার ঠিক করেছিলাম আমরা তিন-চারজনে গাড়ীর মধ্যে পায়খানা করব, কিন্তু সাহসে কুলোয়নি। তবে ধারাল ছুরি দিয়ে টায়ার কেটেছি অনেকবার।

—সুশীল না?

—আরে বাবুল?

—কেমন আছিস?

—মোটামুটি একরকম।

—মোটামুটি একরকম কেন? বল ভালই আছিস, কি বল?

সুশীল হাসল। তোর মত ভাল নেই।

আমিও হাসলাম। আমি খুব ভাল আছি নাকি?

—একশবার। তুই যে একটা কেউকেটা হয়েছিস, তা সবাই জানে।

সুশীল আমার দিকে তাকাল।

—কি করছিস, কারখানা দেখাশুনা করছিস?

—কারখানার সঙ্গে আর আমাদের কানেকশন নেই।

—তার মানে?

—আমরা তো আলাদা হয়ে গেছি। কারখানা এখন শুধু কাকার।

—কাকার মানে কানাইদার?

—হ্যাঁ।

—কানাইদা এখন কেমন আছেন?

—কাকার তো প্যারালিসিস হয়েছে।

—সে কি রে ! মুখে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করলেও মনে মনে যেন খুশী হলাম।

—বহুকাল তো কাকা শয্যাশায়ী। ডান দিকটা একেবারে পড়ে গেছে। হাঁটা চলা সব কিছু বন্ধ।

আবার সমবেদনা জানালাম, তাহলে তো বড় কষ্ট পাচ্ছেন। বিশেষ করে এ্যাকটিভ লোকের পক্ষে শুয়ে থাকা · · ·

ওরা ওদের কাকাকে বরাবরই নেতাজীর মত দুঃসাহসিক, জামসেদজী টাটার মত দূরদর্শিতা-সম্পণ শিল্পপতি, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের মত মানব দরদী ও আরো কত কী ভাবত। তাইতো বললো, সত্যি কাকার জন্য ভীষণ দুঃখ হয়।

মনে মনে ভগবানকে শতকোটি প্রণাম জানালাম। বললাম, তুমি যে এত তাড়াতাড়ি ওকে হিসাব নিকাশ বুঝিয়ে দেবে, ভাবতে পারিনি। যে হাত যে পা দিয়ে কানাইদা ঐ গরীব ছেলেগুলোকে চোরের মতো মারত, সেই হাত পা যদি ··

হয়তো আরও কিছু ভাবতাম, কিন্তু বাধা পড়ল। সুশীল জিজ্ঞাসা করল, আমার বাসায় আসছিস তো ?

—তোর বাসায় মানে ?

—আমি চৈতন পাড়ায় বাসা করেছি।

—কতদিন ?

—বিয়ের পরেই।

—কেন ? বিয়েতে বুঝি বাড়ীর মত ছিল না ?

—আর বলিস না। বাড়ীর সব এমন কনজারভেটিভ যে কি বলব।

সুশীল নিজেও যে খুব প্রগতিবাদী, তা আমি কোনদিনই মনে করেনি। আজও করলাম না। সুতরাং সে কথা এড়িয়ে জানতে চাইলাম, তোর শ্বশুর বাড়ী কোথায়।

খুব আগ্রহের সঙ্গে ও বললো, এইতো ঘোষ পাড়ায়। যাবি, শালা-শালীদের কাছে তোর অনেক কথা বলেছি। গেলে সবাই খুব খুশী · ···

বুঝলাম, ওপার বাংলার মেয়ে; তবু ন্যাকামি করে জিজ্ঞাসা করলাম, এখানকারই মেয়ে বুঝি ?

—বাড়ী ওদের নোয়াখালিতে। তবে খুব ভাল ফ্যামিলি। দারুণ প্রগ্রেসিভ।

ওর কথায় আমি না হেসে পারলাম না। ঠাট্টা করে বললাম, যে বাঙালদের এত ঘেন্না করতি সেই বাঙালদের ঘরের মেয়েকে বিয়ে করলি?

সুশীল দাঁত বার করে একটু হাসল। আমি বললাম, চলি আবার দেখা হবে।

—আমার বাসায় আসছিস তো?

—নারে। আজকে আর সময় হবে না। পরের বার······

—এলে কিন্তু পারুল খুব খুশী হতো।

আমি আবার ঠাট্টা করে বললাম, আমার মতো ব্যাচিলারের সঙ্গে তোর স্ত্রীর আলাপ করিয়ে দেওয়া কি ঠিক হবে?

আগের বালীগ্রাম আর নেই। খানা-ডোবা নালা নর্দমা আগের মতো থাকলেও ফাঁকা জায়গা সব ভরে গেছে। নতুন নতুন বাড়ী উঠেছে। নতুন নতুন লোক। আমি এসব বাড়ীর কাউকে চিনব না বলে একবার দেখে চোখ ঘুরিয়ে নিয়েছিলাম। সুশীলের সঙ্গে কথা বলছিলাম। হঠাৎ নতুন বাড়ীর জানালা দিয়ে উঁকি মেরে একজন বললো, কি রে সুশীল, কার সঙ্গে এত বকবক করছিস?

—দিল্লী থেকে বাবুল এসেছে।

—আমাদের বাবুল?

—তবে আবার কোন বাবুল।

সুশীলের কথা শেষ হতে না হতেই লুঙ্গি গেঞ্জি পরে একজন বেশ বয়স্ক ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, কিরে কখন এলি?

আমি ঠিক চিনতে পারলাম না। সাধারণ ভাবে উত্তর দিলাম, এইত এখুনি।

—আয় আয় ভিতরে আয়।

—আজকে একটু তাড়া আছে···।

—বাজে চালিয়াতি না করে ভিতরে আয়।

কথাটা শুনেই খারাপ লাগলো। বললাম, আপনাকে ঠিক চিনতে পারছি না তো?

সুশীল হাসতে হাসতে বললো, ও আমাদের বিশু! কিন্তু ব্যাটা ব্যবসা করে এমন ফুলতে আরম্ভ করেছে যে চেনার উপায় নেই।

বিশু ভট্চাজ। অবাক হয়ে একবার বিশুর দিকে তাকিয়ে বললাম, মাই গড! কি মোটা হয়েছিস রে?

সুশীল ফিস ফিস করে বলল, ব্যাটা মাল টেনে টেনেই হাতি হবে।

কলেজে উঠেও আমি সিগারেট খেতাম না। তবে বন্ধু-বান্ধবদের পাল্লায় পড়লে মাঝে-মাঝে খেতাম। না খেয়ে পারতাম না। একবার পুজোর সময় আমরা দল বেঁধে কলকাতায় ঠাকুর দেখতে বেরিয়েছিলাম। সেদিন সবাই ক্যাপষ্টান টেনেছিলাম। শুধু বিশু টানেনি। ও নস্যি নিচ্ছিল। ঘুরতে ঘুরতে লেকে গিয়ে ওকে আমরা সবাই মিলে অনেক অনুরোধ করলাম, কিন্তু ও তবু আমাদের অনুরোধ রাখল না। আমি সেই সব দিনের কথা ভাবতে গিয়ে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। ইতিমধ্যে সুশীল চলে গেছে। বললাম, নস্যি তাহলে ছাড়লি।

বিশু আবার লুঙ্গিটা সামলাতে সামলাতে বললো, আরে মাল টানে সব ব্যাটাই, বদনাম হয় বিশু ভট্চাজের।

বিশুর সঙ্গে গল্প করার প্রবৃত্তি আমার ছিল না কিন্তু তবুও ওর একটু জীবন কাহিনী জানার আগ্রহ চেপে রাখতে পারলাম না।

—কিসের ব্যবসা করেছিস?

—বৌবাজারে একটা জুতোর দোকান করেছি।

পুরুত ঠাকুরের ছেলে জুতোর ব্যবসা করছে, সুশীল ঘোষ পাড়ার পারুলকে বিয়ে করেছে, হলো কি বালীগ্রামে। এ ক'বছরে সব কিছু উল্টে পাল্টে গেল? ভারী মজা লাগছে। না জানি আরও কত কি দেখব শুনব। এত মজা দেখতে পাব জানলে সারা দিনটাই এখানে কাটাতাম। সুশীলের বৌ দেখতাম, বিশুর মদ খাওয়া দেখতাম।

—ভালই করেছিস। ব্যবসার মত জিনিস আছে?

বিশু অনেকবার চা খেতে বললো। আমি রাজী হলাম না। অনেক করে বুঝিয়ে বললাম। তবুও নাছোড়বান্দা। শেষে বললাম তোর পয়সায় চা খেয়ে কি শান্তি পাব? তার চাইতে সামনের বার এসে একটা বোতল নিয়ে বসা যাবে, কি বল?

—তুই আসবি কি?

বিশুর কানে কানে ফিস ফিস করে বললাম, মাল খেতেও আসব না?

বাসীতে এলে এই একি বিপদ। এত জানাশুনা লোক যে রাস্তায় গল্প করতে করতেই সময় ফুরিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত নিজেদের বাসায় গিয়ে একটু বসেই উঠতে হয়। দাদা-বৌদি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন আমাকে ভুল বুঝে। ভাবে আমি ওদের পছন্দ করি না। ওদের দূরে সরিয়ে রাখতে চাই। তারপর খাবার-দাবার দিলে খাই না। খেতে পারি না। রাস্তাতেই কোন না কোন বাড়ীতে খেতেই হয়। আপত্তি করলে শোনে না। এইত মেজ বৌদিকে কত করে বললাম, কিন্তু শুনল কি আমার কথা? আজও বৌদি রাগ করবে। একেই তো বৌদির বোনকে বিয়ে করিনি বলে বৌদির মনে অভিমান জমে আছে। অনেক চেষ্টা করেও বৌদিকে আমার কথা বুঝাতে পারিনি। আজকাল বুঝাবার চেষ্টা করি না। যে বুঝবে না, তাকে বুঝাবার চেষ্টা করে লাভ নেই। যাকে ভাল লাগে না, যাকে পছন্দ করি না, শুধু দাদা বৌদিকে খুশী করার জন্যে তাকে বিয়ে করা যায়? অন্ততঃ আমার পক্ষে অসম্ভব। ঐতো রূপের ছিরি। তারপর ম্যাট্রিক ফেল। শুধু কোমর দুলিয়ে হাঁটতে পারে বলেই কি বৌদির বোনকে বিয়ে করা যায়?

হাঁটতে হাঁটতে বৌদির বোনের কথাই ভাবছিলাম। তখন দাদার নতুন বিয়ে হয়েছে। বৌদির বোনের সঙ্গে ঠাট্টা ইয়ার্কি করতাম। মন্দ লাগত না। সেবার দোলের দিন বোধহয় একটু বাড়াবাড়ি হয়েছিল। আমি হয়ত অতটা বাড়াবাড়ি করতাম না, কিন্তু সুলেখা এমন ফাজলামি শুরু করল যে শেষ পর্যন্ত আমি হঠাৎ জড়িয়ে ধরে আচ্ছা সে আবীর না মাখিয়ে পারলাম না। বৌদি ভাবল আমি বোধহয় ওর বোনের প্রেমে পড়েছি। কিছুদিনের মধ্যেই বৌদি একদিন……

ঢিপ করে প্রণাম করেই জিজ্ঞাসা করলাম, মাসিমা, চিনতে পারছেন?

নিকেলের ফ্রেমের চশমাটা একটু হাত দিয়ে ধরে মাসিমা আমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, তুই কে আমি তো চিনতে পারছি না?

—আমি বাবুল।—কোন্ বাবুল?

—শঙ্করের বন্ধু বাবুল।

—মাসিমা একগাল হাসি হেসে বললেন, নারকেলের সন্দেশ?

আমিও হাসলাম। হ্যাঁ ঠিক ধরেছেন তো?

—তোর নারকেলের সন্দেশ খাবার গল্প এখনও আমি কতজনকে করি জানিস?

—তাই বুঝি ?

—হ্যাঁরে।

গল্প করার মত ব্যাপারই বটে! মাসিমার ছোট ছেলে শঙ্কর আমার খুব বন্ধু ছিল। সময় পেলেই শঙ্করদের বাড়িতে গিয়ে আড্ডা দিতাম। একবার মাসিমা বাড়ীর সবাইকে নিয়ে কল্যাণেশ্বর-তলায় পূজা দিতে গিয়েছেন। বাড়ীতে শুধু শঙ্কর ছিল। আমি গিয়ে হাজির। ভীষণ খিদে পেয়েছিল। দুজনে মিলে অনেকক্ষণ অনেক খোঁজাখুঁজির পর অনেকগুলো নারকেলের সন্দেশ পেলাম। একটা একটা করে সবগুলো আমি খেয়ে ফেললাম। পরে শুনি ওগুলো লক্ষ্মী পূজার জন্য মাসিমা তৈরি করেছিলেন। ঘটনাটা জানাজানি হবার পর থেকেই মাসীমা আমাকে প্রায়ই নারকেলের সন্দেশ খাওয়াতেন আর ওদের বাড়ীতে আমার নাম হয়ে গেল নারকেলের সন্দেশ। এতদিন পর মাসীমাকে দেখে সেই সব ছেলেমানুষীর কথা মনে না করে পারলাম না।

—মাসীমা শঙ্কর কোথায় ?

—ছোট খোকা তো বিলেতে, তুই জানিস না ?

—না। আমি তো অনেকদিন এদিকে আসি না।

—তুইও তো অনেককাল বিদেশে। জানবি কেমন করে। মাসিমা থেমে বললেন, ও তো এখন মস্ত বড় ডাক্তার। এত ভাল ডাক্তার যে সাহেবরা ওকে আসতে দেয় না। তবে ক'বছর আগে এসে বিয়ে করে গেছে।

—তাই নাকি ?

—হ্যাঁ! ভবানীপুরের চৌধুরী বাড়ীতে ওর বিয়ে দিয়েছি। বৌমাও খুব ভাল। এম. এ. পাশ।

শুনে ভীষণ ভাল লাগল। শঙ্কর যখন দু'বছরের তখন ওর বাবা মারা যান। বড়দার বয়স তখন মাত্র ষোল। তারপর তিনটি বোন। সব থেকে ছোট শঙ্কর। রেলের সামান্য চাকরি আর বাড়ী ভাড়ার ক'টা টাকা সম্বল করে কি কষ্টেই ওদের দিন কাটত। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবার পর শঙ্কর তো কিছুদিন কানাইদার ওখানেও কাজ করত। ঠিক মনে পড়ছে না, তবে বোধহয় মারধোর খেয়েই শঙ্কর কানাইদার কাজ ছেড়ে দেয়।

—ও দেশে ফিরবে না ?

—নূতন বাড়িটা তৈরী হলেই ফিরবে বলেছে।

—নতুন বাড়ি বানাচ্ছেন বুঝি ?

—হ্যাঁ।

—কোথায়? এখানে, নাকি কলকাতায়?

—না রে এখানেই। কানাই-এর জমিতে।

—কোন কানাই?

—ঐতো গুণ্ডা কানাই।

—সুশীলের কাকা কানাই?

—আবার কোন্ কানাই।

—উনি জমি বিক্রী করছেন?

—কারখানা তো লাটে উঠেছে। জমি বিক্রী না করলে খাবে কি?

মনে মনে আবার ভগবানকে প্রণাম জানালাম। চাকাটা তাহলে পুরো ঘুরে গেছে, কি বলেন মাসিমা?

মাসিমা শুধু একটু হাসলেন।

নিজের থেকেই বললাম, আজ একটু ব্যস্ত আছি। পরেরবার এসে নারকেলের সন্দেশ না খেয়ে যাবনা কিন্তু।

—ওতে কি আমি ভয় পাইরে?

—বড়দা-বড় বৌদি কেমন আছেন?

—ভালই আছে।

—দাদারা?

—ওরাও ভাল আছে। এবার মাসিমা আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তুই বলে দিল্লী থাকিস?

—হ্যাঁ মাসিমা।

—বিয়ে করেছিস?

—না।

—আর কবে করবি? তুই আর ছোট তো একই বয়সের।

—হ্যাঁ।

—তবে আর দেরি করিস না বাপু।

কথার মোড় ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, ছোট বাড়ির খবর কি?

—মোটামুটি ভালই। তবে ঠাকুরপো প্রেসারে বড় কষ্ট পাচ্ছে।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। দেখলাম ছোট খুকী এসেছে ঠাকুরপোকে দেখতে।

ছোট খুকী, ওদের ছোট খুকী. আমার চন্দনা। চন্দনার বিয়ে হয়ে গেছে? আমার জন্য অপেক্ষা করল না? ও বাড়ীর শুধু শঙ্কর জানত আমি ওর খুড়তুতো বোন চন্দনাকে ভালবাসতাম। আর কেউ না। বোধহয় শঙ্কর থাকলে এমন হতো না।

—ছোট খুকীর কোথায় বিয়ে হয়েছে?

—বিয়ে আর হলো কোথায? বিয়ে করল।

—নিজে পছন্দ করে বিয়ে করেছে বুঝি?

—তাতো বটেই। তাও আবার একটা কায়েতের ছেলেকে।

আমার সেই চন্দনা নিজে পছন্দ করে বিয়ে করেছে? পারল? একবারও আমার কথা মনে পড়ল না? ও যে বলেছিল অপেক্ষা করবে? ধৈর্য ধরতে পারল না?

—আচ্ছা মাসিমা চলি।

সত্যি কথা বলতে কি, একবার চন্দনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যই আজ বালী এসেছি। ভেবেছিলাম চন্দনা আমাকে দেখে চমকে উঠে বলবে, আর কতদিন শবরীর মত প্রতীক্ষা করতে হবে বলতে পার? আমি অর্জুনের মত……

ভাবতে গিয়েও ঘেন্না করল। আমি ঝড়ের বেগে এগিযে চললাম।

এগুতে গিযে আরো কয়েকজনের সঙ্গে দেখা হলো, কিন্তু বিশেষ কথা বললাম না। বলতে ইচ্ছা করল না। একবার মনে হল ফিরে যাই। দরকার নেই বৌদির সঙ্গে দেখা করে। ফিরতে পারলেই ভাল হতো, কিন্তু পারলাম না। এগিয়ে গেলাম। না দেখা করে গেলে অত্যন্ত খারাপ দেখায় বলেই ফিরলাম না।

বৌদিকে গিয়ে মিথ্যা কথা বললাম। জরুরী কাজে আজ সকালে এসেছি। রাত্রেই ফিরে যাচ্ছি।

—আজই ফিরে যাবে?

—হ্যাঁ বৌদি। একটু হেসে জিজ্ঞাসা করলাম, রাজা কোথায়?

—তোমার দাদা ওকে নিয়ে একটা নেমন্তন্নে গেছেন।

আবার মিথ্যে কথা বললাম, বোলো এসেছিলাম। সামনের সপ্তাহে আবার আসব।

—সত্যি?

—হ্যাগো হ্যাঁ।

বৌদির কাছ থেকে প্রায় পালিয়ে বেরিয়ে এলাম। হন হন করে হাঁটতে হাঁটতে বালী থানার দিকে এগুতে লাগলাম। মুখ তুলে তাকিয়ে কারুর দিকে তাকালাম না। ডান দিক-বাঁ দিক কোন দিকে না তাকিয়ে সোজা এগিয়ে চললাম। এমন কি মেজবৌদির সঙ্গেও দেখা করলাম না। বোধহয় ভুলে গেলাম। নাকি ইচ্ছা করল না।

টিপ্‌ টিপ্‌ করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। জি. টি. রোডের মোড়ে পৌঁছে ট্যাক্সির জন্ত একটা গাছের নীচে দাঁড়ালাম। একবার মনে হল শ্মশানের ধারে পটলের চায়ের দোকানে যাই। গেলাম না। দাঁড়িয়েই রইলাম।

—আমার ঠিকানাটা তোমাকে দিতে ভুলে গেছি। শান্তির গলা শুনে চমকে উঠলাম।

—তুমি এখনও দাঁড়িয়ে আছ?

শান্তি কথা না বলে মুখ নীচু করে পাশে দাঁড়িয়ে রইল।

আমিই আবার কথা বললাম, এই অন্ধকারের মধ্যে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছ?

—শুধু আজ কেন? সারাজীবনই তো আমি অন্ধকারে থাকব।

—না, না, তা কেন হবে?

হঠাৎ একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেলাম। ট্যাক্সির দরজা খুলে ভিতরে যাবার আগে শান্তির একটা হাত চেপে ধরে বললাম, দিল্লী এসো। তাড়াতাড়ি, কেমন?

ট্যাক্সিটা চলতে শুরু করল। রাস্তার পাশে দোকানগুলোর রেডিওতে শুনতে পেলাম 'ভরা থাক স্মৃতি সুধায় বিদায়ের পাত্রখানি ........'

## স্মাগলার

তুতুলের বিয়ের নেমতন্ন খেয়ে যখন বর্ধমান ষ্টেশনে হাজির হলাম তখনও শেষ লোক্যাল ট্রেন ছাড়ার কিছু দেরী আছে। টিকিট ঘর থেকে টিকিট কেটে দেশী ধুতির কোঁচা সিল্কের পাঞ্জাবীর পকেটে পুরে প্ল্যাটফর্মে পায়চারী করছিলাম। একজন বুড়ো হকারের কাকুতি-মিনতির জন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও এক ঠোঙা চিনে বাদাম কিনে শেষের বগীতে উঠে বসলাম।

জানলার ধারে বসে একটু এদিক-ওদিক তাকাতে না তাকাতেই নানা

বয়সের বেশ কিছু যাত্রী পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে আমারই বগীতে উঠলো। দশ-বারো বছরের একটা ছেলে আমার সীটের নীচে দু-তিনটে পুঁটলি রেখে আমারই পাশে বসল। বুঝতে পারলাম এরা চালের স্মাগলার। তবু পাশের ছেলেটিকে দেখেই ভাল লাগল। রং ময়লা। পরণে ছেঁড়া শার্ট প্যান্ট, কিন্তু চোখ দুটো ভারী উজ্জ্বল। মুখখানাও ভারী মিষ্টি। আলাপ করার লোভ সামলাতে না পেরে চিনে বাদামের ঠোঙা এগিয়ে ধরে বললাম, নাও চিনেবাদাম খাও।

লজ্জায় নিজেকে একটু গুটিয়ে নিয়ে ছেলেটি বলল, না বাবু আপনি খান।

বোধহয় ঔদার্য দেখাবার জন্যই আমি সস্নেহে ওকে একটু কাছে টেনে বললাম, আমাকে বাবু বলছ কেন? নাও, নাও চিনে বাদাম খাও।

তবু ছেলেটি হাত গুটিয়ে রইল, আমি ওর হাতে চিনে বাদামের ঠোঙাটা গুঁজে দিয়ে বললাম, কি নাম তোমার?

মুখ নীচু করে খুব চাপা গলায় বলল, রঞ্জন সরকার।

খুব সুন্দর নাম তো। কোথায় থাক?

বালীতে।

পড়াশোনা কর না?

রঞ্জন মাথা নেড়ে জানাল, হ্যাঁ।

কোন ক্লাসে?

সেভেন' এ।

আমি ভাবতে পারিনি ও ক্লাস সেভেন' এ পড়ে। ভেবেছিলাম কোন অশিক্ষিত ছোটলোকের ছেলে। লেখাপড়া না করে চালের স্মাগলিং করে। তাই তো ওর কথা শুনে একটু অবাক না হয়ে পারলাম না। প্রায় অবিশ্বাসের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি ক্লাস সেভেন'এ পড়?

আমার প্রশ্নের জবাব দেবার আগেই ও প্রায় লাফিয়ে দরজার কাছে গিয়ে আঠারো উনিশ বছরের একটা ছেলের হাত থেকে একটা রেশন ব্যাগ এনে আবার আমার পায়ের নীচে রাখল। বসল।

ট্রেন ছেড়ে দিল।

জিজ্ঞাসা করলাম, ও কে?

আমার দাদা।

আপন দাদা ?

হ্যাঁ।

ওর নাম কি ?

অঞ্জন সরকার।

ও লেখা পড়া করে ?

হ্যাঁ।

কোন ক্লাসে পড়ে ?

দাদা এবার কলেজে ভর্ত্তি হয়েছে।

আমি আবাক হই। জিজ্ঞাসা করি, কলেজে কি পড়ছে ?

বি-এস-সি।

আচ্ছা !

এতক্ষণ রঞ্জন শুধু আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে। এবার নিজে থেকেই বল, দাদা পড়াশুনায় খুব ভাল। ফার্স্ট' ডিভিশনে হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করেছে। বি-এস-সিতেও নিশ্চয়ই খুব ভাল রেজাণ্ট করবে।

বিশ্বাস করতে কঠিন হলেও অবিশ্বাস করতে পারলাম না। একটু চুপ করে থাকার পর আবার কথা বলি, তোমরা কী দু-ভাই ?

না, আমরা পাঁচ ভাইবোন।

অঞ্জনই সবার বড় ?

হ্যাঁ।

তুমি সব চাইতে ছোট ?

আমার চাইতে ছোট আরেক ভাই আছে।

তোমার বাবা-মা আছেন ?

আছেন।

বাবা কী করেন ?

বাড়ীতে বসেই কিছু ছেলে-মেয়েকে পড়ান।

কোন চাকরি-বাকরি করেন না ?

না।

শেষ লোক্যাল ট্রেন। সব ষ্টেশনেই থামছে। রসুলপুর মেমারী বেশ কিছুক্ষণ আগেই পার হয়েছি। আরো কয়েকটা ষ্টেশনে গাড়ী থেমেছে, ছেড়েছে। খেয়াল করিনি। আবার ট্রেনটা থামতেই দেখি মগরা এসে গেছি।

তুমি কি রোজ বর্ধমান আসো ?

না। সপ্তাহে দুদিন।

তোমার দাদা ?

চারদিন।

অন্য দুদিন কি তোমার দাদা একলাই আসে ?

না, দাদা আর মেজদা আসে।

বর্ধমান থেকে কত চাল নিয়ে যাও ?

এক একজনে দশ সের।

ধরা পড় না ?

জনা প্রতি এক সের চাল দিয়ে দিই বলে রেল বা পুলিশের কেউ আমাদের ধরে না।

শেষ বর্ধমান লোকাল হাওড়ার দিকে এগিয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে থামছে, যাত্রীরা ওঠানামা করছে। আমরাও গল্প করছি। শুনছি রঞ্জনের কথা। নানা কথা, বাড়ীর কথা, বাবা-মার কথা, ভাইবোনের কথা, পড়াশুনার কথা।

ওদের আদি বাড়ী ছিল ফরিদপুর। তবে ঠাকুর্দা ঢাকায় চাকরি করতেন বলে রঞ্জনের বাবা হরিদাসবাবু ঢাকাতেই পড়াশুনা করেছেন। জগন্নাথ কলেজ থেকে বি-এ পরীক্ষা দেবার বছর খানেক আগে হঠাৎ হরিদাসবাবুর বাবা মারা যাওয়ায় সংসারে বিপর্যয় নেমে আসে।

জিজ্ঞাসা করলাম, তারপর ?

তারপর থেকে বাবা শুধু কষ্টই করছেন। অথচ বাবা যদি লেখাপড়া করতে পারতেন তাহলে উনি সত্যিই অনেক নাম করতেন।

তোমাদের কোন আত্মীয়-স্বজন ছিলেন না ?

আত্মীয়েরাই আমাদের সব চাইতে বেশী ক্ষতি করেছেন।

তোমার বয়স বেশী না হলেও তুমি তো তোমাদের ফ্যামিলীর খবর বেশ জান ?

বাবা-মা দুঃখ করে এসব কিছু বলার পর সব সময় আমাদের বলেন, তোরা মানুষের মতো মানুষ হলে একবার মামার কাছে যাব।

তাই নাকি ?

আমার কথা রঞ্জনের কানে পৌঁছাল না। ও আপন মনেই বলে গেল,

বাবা বলেন, মামার বাড়ী যাবার দিন দ্বারকনাথ ঠাকুরের মতো ঘোড়ায় জেঙে সেণ্ট মাখিয়ে আর চর্বিতে ডায়মণ্ড লাগিয়েই যাব। তার আগে মামাকে মুখ দেখাব না।

বালী এল। আরো অনেকের সঙ্গে ওরা দু-ভাইও নেমে পড়ল।

এসব অনেকদিন আগেকার কথা। তারপর কতকগুলো বছর পার হয়ে গেল। কত কী ঘটে গেল আমাদের সংসারে। তাসের ঘরের মত একটার পর একটা স্বপ্ন ভেঙে গেল। বেহালার কারখানা, যাদবপুরের জমি, কালী-ঘাটের বাড়ী সব হাতছাড়া হলো। দাদা শ্বশুর মশায়ের কৃপায় ডুয়ার্সে'র এক চা-বাগানে কেরাণীগিরির চাকরি নিয়ে চলে গেল। মেজদা প্রথমে আমাদের বেহালার কারখানার এক সাপ্লায়ারের আসাম অফিসে চলে গেল, কিন্তু বছর খানেক ঘুরতে না ঘুরতেই বারো হাজার টাকার একটা পেমেণ্ট মেরে দেবার জন্য তিন বছর জেল কাটিয়ে এখন কাটিহারে একটা চায়ের দোকান করেছে। আমি? আমারই বাল্যবন্ধু ভুতুলের নার্সিং হোমে তিনশ পঁচিশ টাকার কেরাণী। একবার ভেবেছিলাম অন্য কোথাও চলে যাই, কিন্তু মাকে ছেড়ে যেতে পারিনি।

সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটের দুখানা ঘরে আমরা থাকি। সঙ্গে নোংরা একটা বাথরুম পায়খানা আছে, কিন্তু রান্নাঘর নেই। বারান্দাতেই রান্না করতে হয়। আমার স্ত্রী রাগারাগি করলেও মার মুখে কোনদিন কোন অভিযোগ শুনিনি। একদিন জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা মা, সারা জীবন সুখে কাটিয়ে এখন তোমার খুব কষ্ট হয়, তাই না?

মা একটু হাসলেন। বললেন, এখনই বরং সুখে আছি।

তার মানে?

সংসারে অভাব না থাকলেই কী সুখ থাকে?

মা আর কোন কথা না বলে চলে গেলেন। আমিও চুপ করে বসে রইলাম।

সেদিন রবিবার। আমি তখনও বিছানায় এপাশ-ওপাশ করছি। মানু মাদুরে বসে পড়ছে। হঠাৎ আমার স্ত্রী এসে বলল, কেউ বোধহয় এসেছেন। একবার দেখোতো।

আমি উঠে দরজা খুলতেই একজন ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, এটাই কি বিনোদবাবুর বাসা?

হ্যাঁ।

উনি আছেন?

হ্যাঁ।

ওনার স্ত্রী?

হ্যাঁ মাও আছেন।

ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে সামনের গাড়ীর দরজা খুলে এক বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাকে বললেন, এসো।

বাবা ওকালতি করেছেন বহুকাল। ওঁর কিছু পুরোনো উকিল বন্ধু এখনও মাঝে মাঝে আমাদের বাসায় আসেন। আমি বুঝলাম ওদেরই কেউ এসেছেন। দ্বিধা না করে ওদের বললাম, আসুন।

বাবা বিছানাতে আধ-শোয়া অবস্থাতেই জিজ্ঞাসা করলেন, কে? বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি এগিয়ে বাবাকে প্রণাম করে বললেন, আমি ভোম্বল।

বাবা অদ্ভুত ভাবে চিৎকার করে উঠলেন, কী বললেন?

বলছি আমি ভোম্বল।

ভোম্বল। সরলার ছেলে ভোম্বল?

আজ্ঞে হ্যাঁ। ভদ্রলোক এবার পিছন ফিরে স্ত্রী আর ছেলেকে ডাক দিলেন, তোমরা প্রণাম কর।

ওরা দুজনে বাবার ঘরে ঢুকতেই আমি পিছন দিকের বারান্দায় গিয়ে মাকে বললাম, মা, ছাখ তো কারা এসেছেন?

মা উঠলেন না, কোন কথাও বললেন না।

কি হল মা, তুমি একবার বাবার ঘরে······

মা একটু রেগেই জবাব দিলেন, দেখছিস তো কাজ করছি।

ঠিক সেই সময় বাবার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, শুনছ একবার এদিকে এসোতো?

মা গম্ভীর হয়ে আমার স্ত্রীকে বললেন, ছোটবৌমা বল তো আমি কাজ করছি।

ছোটবৌমা মার আদেশ পালন করতে চলে গেলে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা মা কি ব্যাপার বলতো?

ঠিক আগের মত গম্ভীর হয়েই মা জবাব দিলেন, একটু পরেই সব জানতে পারবি।

তার মানে ?

মা দপ করে জলে উঠলেন, এই সাত সকালে আমা[redacted]

মার বকুনি শুনেও আমি নড়তে পারলাম না। চুপ করে দাঁ[redacted]

ভাবনা-চিন্তা করেও মার এইরকম মনোভাবের কোন কারণ ৷

হঠাৎ আমার স্ত্রী পিছন থেকে বলল, সরে দাঁড়াও তো।

দেখি আমার স্ত্রীর পিছনে ওরা তিনজন দাঁড়িয়ে। বৃদ্ধ ভদ্র[redacted]

হাসতে বললেন, মামী আমি ভোম্বল।

চোরের মত মা একবার তাকিয়েই চোখ গুটিয়ে নিলেন। এ[redacted]

করে তাকিয়ে দেখি মার দুচোখ বেয়ে জল পড়ছে।

কি হল মামী কাঁদছ কেন ?

মা কাঁদতে কাঁদতে বললেন, যে মামা তোদের পথে বসিয়েছিলেন, তার বাড়ীতে আসতে ঘেন্না করলো না ?

উনি হাসতে হাসতেই বললেন, মামা-মামীর কাছে আসব, তাতে আবার ঘেন্না কিসের ?

আমি আর আমার স্ত্রী নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। মা বললেন, ধর্মের ঢোল একদিন না একদিন বাজবেই। আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতেমা আমার স্ত্রীকে বললেন, জান ছোটবৌমা, এই ভোম্বলের মার সর্বস্ব হরণ করে ঢাকা কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের টাকা মেরেই তোমার শ্বশুর বড়লোক হয়েছিলেন।

ওসব কথা বাদ দাও মামী।

উনি বারণ করলেও মা চুপ করলেন না। এতকাল যেসব কথা কোনদিন কাউকে বলেননি,বলতে পারেননি, এক নিঃশ্বাসে মা সে সব কথা বলে গেলেন।

এতক্ষণে আমি কথা বললাম, চলুন ঘরে গিয়ে বসি। উনি আমার দিকে তাকিয়ে বলিলেন, আমি তোমার আপন পিসতুতো দাদা।

বুঝতে পেরেছি। আমার ভাল নাম হরিদাস সরকার। মামা-মামী আমাকে ভোম্বল বলে ডাকেন।

আমি তাড়াতাড়ি ওঁকে আর বৌদিকে প্রণাম করলাম। উনি আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, মামী বরাবরই আমাকে খুব ভালবাসেন,কিন্তু নানা কারণে বহুকাল তোমাদের ওখানে আসতে পারিনি।

মা গর্জে উঠলেন। চেপে যাচ্ছিস কেন ? বল না তুই বালীতে সাইকেল রিক্সা চালাতিস বলে মামা ঘেন্নায় কালীঘাটের বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

হ্যাঁ।

উনি আছেন?

হ্যাঁ। উঠলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, আপনারা কি বালীতে থাকেন?

ওনার স্ত্রী? না, তবে বহুকাল ছিলাম।

হ্যাঁ মাও আছেন।

ভদ্রলোক সঙ্গে সতে বললেন, ও এম. আর. সি. পি. পাশ করে বিলেতেই

বললেন, এসো।

বাবা ওকাল?

মাঝে মাঝে ভং ওকে চিনলে কেমন করে?

দ্বিধা না ক' দিন আগে একবার লাস্ট লোক্যালে দেখা হয়েছিল।

ব' ম্বলদা উদার পরিতৃপ্তির হাসি হেসে বললেন, তখন ছেলেদের দিয়ে

. চালের স্মাগলিং করাতাম।

আমি কোন কথা বলতে পারলাম না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। ভোম্বলদা বললেন, তাহলে তো তুমি একেও দেখেছ।

এই বলে পাশ ফিরে তাকাতেই জিজ্ঞাসা করলাম, ইনিই কি অঞ্জন?

হ্যাঁ।

মা আর আমার স্ত্রী অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আমার কথ শুনছেন। আমি আবার প্রশ্ন করি, ইনিই কি হায়ার সেকেণ্ডারীতে ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করে বি. এস. সি পড়তেন? আবার সেই পরিতৃপ্তির হাসি হেসে উনি বললেন, ও বরাবরই খুব ভাল রেজাল্ট করেছে।

মা জিজ্ঞাসা করলেন, এখন কি করছে?

মামী, ও এখন বীরভূমের ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রে . আমি নির্বাক।

মা বললেন, বাঃ খুব আনন্দের কথা। এক মুহূর্তের মধ্যে মার সারা মুখখানা বেদনায় কালো হয়ে গেল। বললেন, আমার এক ছেলে চুরি করে জেল কাটছে তা জানিস তো?

সবাই চুপ। হঠাৎ আমার ঘর থেকে মাতুর গলা ভেসে এলো—

বাঁশ বাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠছে ঐ।
মাগো আমার শোলক বলা কাজলা দিদি কই?

ভোম্বলদা দু'পা এগিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করলেন, মামী, তুমি আমাকে এই কবিতাটি মুখস্থ করিয়েছিলে, তা তোমার মনে আছে?

খুব জোরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মা বললেন, তোমার মামা ভোলা চাইলেও, আমি কিছুই ভুলিনি। সব কিছুই আমার মনে আছে।